ওঁ তৎসৎ।

জ্ঞান ও ধর্ম্মের উন্নতি।

(শ্রীমৎ প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের উপদেশ।)

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক

লিখিত।

কলিকাতা

আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে

শ্রীকালিদাস চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১৮১৫ শক।

মূল্য ॥৵০ আনা মাত্র।

উৎসর্গ পত্র।

যাঁহার যত্ন ও চেষ্টা না থাকিলে পূজ্যপাদ পিতামহের "ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান" প্রভৃতি অন্যান্য উপদেশগ্রন্থ প্রাপ্ত হইতাম না; যাঁহার বিষয় আমাকে বলিতে বলিতে পূজ্যপাদ এক দিন বলিয়াছিলেন যে "তোমার পিতা নাই— এখন আমার কথা আর কে লিখিয়া রাখিবে", সেই পরম পূজনীয় পরলোকগত পিতৃদেব হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের শ্রীচরণে এই গ্রন্থখানি ভক্তিপূর্ণ-হৃদয়ে উৎসর্গ করিলাম।

সেবক

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ভূমিকা।

আমাদের সৌভাগ্যবশতঃ আমরা শৈশবকাল হইতেই পূজ্যপাদ পিতামহের যত্নে ব্রাহ্মধর্ম্মের মধ্যে লালিত পালিত হইয়াছি। এই ব্রাহ্মধর্ম্ম কত সময়ে ঘোর অশান্তির মধ্যে হৃদয়ে অপূর্ব্ব শান্তি প্রদান করিয়াছে; কত সময়ে আত্মাকে অনন্ত উন্নতির সত্য আশাবাণী দ্বারা আশান্বিত করিয়াছে। যাঁহারা ব্রাহ্ম সাহিত্য সুন্দররূপে আলোচনা করিবেন, তাঁহারা স্পষ্টই উপলব্ধি করিবেন যে, জগতে এক মহান্ উন্নতির স্রোত অবিশ্রান্তভাবে কার্য্য করিতেছে, এইভাবটী ব্রাহ্মসাহিত্যের মধ্যে ওতপ্রোতভাবে রহিয়াছে। আর আমরাও প্রত্যক্ষ করিতেছি যে ধীরে ধীরে কত জাতি উন্নতির পথে উঠিতেছে। হয়তো কোন জাতি নিজেদের দোষে অবনত হইয়া পড়িল; কিন্তু তাই বলিয়া উন্নতির স্রোত বন্ধ হইতে পারে না। সেই জাতির ভগ্নাবশেষ লাভ করিয়া আর দশ জাতিকে আরও অধিকতর উন্নতিতে আরোহণ করিতে দেখা যায়। বর্ত্তমান গ্রন্থের মধ্যেই তাহার দৃষ্টান্ত দেখা যাইবে।

এখন যেমন আমরা নানা জাতিকে উন্নতি-শিখরে আরূঢ় দেখিতে পাই, পুরাকালেও সেইরূপ অনেক জাতি অনেক উন্নত হইয়াছিলেন; যথা—ভারতীয় আর্য্যগণ, পারসীক, ইহুদী প্রভৃতি। তন্মধ্যে ভারতীয় আর্য্যগণ সভ্যতায় ভদ্রতায় উচ্চতম স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগেরই জ্ঞান ও ধর্ম্মের উন্নতি কেমন করিয়া ক্রমে ক্রমে হইয়াছিল, তাহাই এই গ্রন্থে সবিশেষ লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

বর্ত্তমান গ্রন্থ সম্বন্ধে পূজ্যপাদ প্রায়ই বলেন যে ইহা তাঁহার "পথের কথা"; তিনি বলেন যে তিনি ব্রহ্মলোকের যাত্রী

হইয়া চলিতেছেন এবং সেই চলিবার পথে তিনি গুটিকতক উপদেশ বলিয়া দিলেন। ইহা অতি প্রকৃত কথা। তিনি যখন ব্রাহ্মসাধারণকে তাঁহার "উপহার" প্রদান করিয়াছিলেন, তখন তাঁহার অতি সঙ্কট অবস্থা। ঈশ্বরপ্রসাদে তিনি অপেক্ষাকৃত আরোগ্য লাভ করিয়াও ভাবিতে পারেন নাই যে তিনি আরও উপদেশ দিতে পারিবেন। আরোগ্য লাভের পর তাঁহাকে অনেকবার বলিতে শুনিয়াছিলাম যে তাঁহার "উপহার" কেবলমাত্র "উপহার" নহে—ইহা "উপসংহার"ও বটে। কিন্তু ঈশ্বরের ইচ্ছাবশতঃ তাঁহার "উপহারেই" উপসংহার হইল না; তাঁহাকে আরো দুই একটি কথা—এই "পথের কথা" বলিয়া যাইতে হইল। সমস্ত জীবন সাধনা করিয়া, ঈশ্বরচরণে আত্মসমর্পণ করিয়া তিনি ঈশ্বর সম্বন্ধে যে গভীর জ্ঞান লাভ করিয়াছেন, তাহার কতক আভাস যে এই গ্রন্থে আছে তাহা বলা বাহুল্য! এই কারণে ইহা সাধকগণের পক্ষে উপাদেয় হইবে বলিয়া মনে হয়।

এই গ্রন্থে কতকটা অসম্পূর্ণতা দৃষ্ট হইলেও হইতে পারে। তাহার কারণ এই যে এই গ্রন্থ-নিবদ্ধ উপদেশগুলি উপদেষ্টা কর্তৃক বক্তৃতার ভাবেও কথিত হয় নাই কিংবা রচনার ভাবেও লিখিত হয় নাই। পিতামহ যেমন পৌত্রাদির নিকট রামায়ণ মহাভারতের সুনীতিপূর্ণ গল্প করেন, সেইভাবে পূজ্যপাদ আমাদিগকে কথাচ্ছলে উপদেশ বলিয়া গিয়াছেন, আর আমি সেইগুলি লিপিবদ্ধ করিয়া লইয়াছি।

কলিকাতা
বৈশাখ ১৮১৫ শক।

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সূচীপত্র।

জ্ঞান ও ধর্ম্মের উন্নতি

প্রথম উপদেশ—সৃষ্টি।

(১১ ফাল্গুন রবিবার ব্রাহ্মসম্বৎ ৬১, ১৮১২ শক।)

যখন দেশ ছিল না, কাল ছিল না, তখন অনন্ত জ্ঞানস্বরূপ সেই পূর্ণ পুরুষ আপনার জ্ঞানে, প্রেমে, মঙ্গলভাবে পূর্ণ সৌন্দর্য্যে বিরাজ করিতেছিলেন। সেই অনন্ত জ্ঞানের যে মঙ্গল ইচ্ছা, তাহা তিনি আপনি নিত্যই জানিতে-ছিলেন। সেই মঙ্গল ইচ্ছা কি, না, তাঁর সৃষ্টিতে জ্ঞানধর্ম্মের উন্নতি হউক। ঈশ্বর, তাঁহার এই মঙ্গল ইচ্ছা আমাদিগের নিকট প্রকাশ করিয়াছেন; তাঁহার আনন্দ, প্রেম, সৌন্দর্য্য সৃষ্টির মধ্যে বিতরণ করিয়া রাখিয়া-ছেন। তাঁহার উদ্দেশ্যই এই যে, জ্ঞান ধর্ম্মের উন্নতি হউক।

তিনি তাঁহার শক্তি এই অনন্ত আকাশে

ব্যাপ্ত করিলেন। সেই শক্তি—নীহারিকা (ether)। তিনি সেই নীহারিকা বিকম্পিত করিয়া দিলেন, আর তাহা একেবারে জ্বলিয়া উঠিল। ইন্দ্রিয়ের অগোচর নীহারিকা প্রত্যক্ষের বিষয় হইল। তাহার জ্যোতিতে সমুদয় আকাশ জ্যোতিষ্মান্ হইয়া উঠিল। সৃষ্টির প্রারম্ভে যদি কেহ থাকিত, তবে সে বুঝিতে পারিত যে, কেমন আশ্চর্য্য রকমে চারিদিকে জ্যোতির আবির্ভাব হইয়াছিল। এই জ্যোতির মধ্যে থাকিয়া তিনি আপনার মঙ্গল ইচ্ছা নিত্যই জানিতেছিলেন।

তিনি ইচ্ছা করিলেন, আর অমনি সেই জ্যোতি ও তেজ ঘনীভূত হইয়া অগণ্য সূর্য্যরূপে পরিণত হইল। যেখানে অন্ধকারের মধ্যে নিবিড় অন্ধকার ছিল, সেই খানে দীপ্তিমান্ কোটি কোটি সূর্য্যের উদয় হইল। অগণ্য সূর্য্য ঊর্দ্ধেতে, অধোতে, দক্ষিণে, বামে তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিয়া ঘুরিতে লাগিল। তাঁর

ইচ্ছাক্রমে প্রত্যেক সূর্য্য হইতে গ্রহ উপগ্রহগণ বিক্ষিপ্ত হইয়া সেই প্রতি সূর্য্যের চারিধারে ঘুরিতে লাগিল, অথচ ইহাদিগের মধ্যে কোন একটী অন্যের গাত্রে পতিত হইয়া চূর্ণ বিচূর্ণ হইল না।

এই অক্ষর পুরুষের শাসনে এই অগণ্য সূর্য্যচন্দ্র বিধৃত হইয়া স্থিতি করিতেছে। তাঁর সৃষ্টি এই অসীম আকাশে দেশকালসূত্রে গ্রথিত হইল।

তিনি তাঁহার শক্তি সমুদয় আকাশে ব্যাপ্ত করিয়া দিলেন। সেই শক্তি আমাদের এই জড়শক্তি; এই জড়শক্তি আকর্ষণ বিয়োজন রূপে, ঘাত প্রতিঘাতরূপে সমুদয় পদার্থে কার্য্য করিতেছে। নীহারিকা, বায়ু, অগ্নি প্রভৃতি স্থূল সূক্ষ্ম পদার্থ সকল আকাশে ওতপ্রোত হইয়া রহিয়াছে; এবং তিনি এই সমুদয়ই ধারণ করিয়া রহিয়াছেন।

আমরা বিজ্ঞান, জ্যোতিষ, পদার্থবিদ্যা বা

রসায়ন, যে শাস্ত্র যতই আলোচনা করি না কেন, তথাপি আমরা সৃষ্টি-কৌশলে ঈশ্বরের অনুপম নৈপুণ্যের অন্ত পাই না। আজ কয়েক বৎসর হইল, একটা প্রকাণ্ড ধূমকেতুকে পৃথিবীর নিতান্ত অভিমুখীন হইতে দেখিয়া, জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ পৃথিবীর বিনাশ সম্বন্ধে এক-প্রকার নিঃসংশয় হইয়া বসিয়াছিলেন; কবে উভয়ের সংঘর্ষণে উভয়েই চূর্ণ হইয়া যাইবে, এই ভয়ে তাঁহারা অস্থির হইয়া উঠিয়া-ছিলেন। এমন সময়ে সেই ধূমকেতু আপ-নারই তেজের আধিক্যে আপনা হইতেই খণ্ডবিখণ্ড হইয়া গেল এবং পৃথিবীও আকস্মিক বিপদ্ হইতে রক্ষা পাইল। যেখানে মনুষ্যের গণনা নিতান্ত ভীতিজনক, সেখানে ঈশ্বরের পালনী শক্তিই আমাদের আশা ভরসা সকলই।

তাঁহার কৌশল কি আশ্চর্য্য। এই পৃথি-বীতে আমরা এক সূর্য্যের উদয় দেখিতেছি,

কিন্তু জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ বলেন যে এমনও সব লোক আছে, যেখানে এক সূর্য্যের উদয় হইতেছে অন্য সূর্য্য অস্ত যাইতেছে। সূর্য্য-দিগের মধ্যে আবার বর্ণভেদ কত—কোনটা লোহিত, কোনটা বা পীত, কোনটা নীলবর্ণ। ইহাদিগের সংখ্যাই বা কত, ইহাদের এক-দণ্ডের জন্য বিরাম নাই, সকলেই অসীম বেগে ধাবিত হইতেছে। সেই "একোবশী" সর্ব্ব-নিয়ন্তা পুরুষের শাসন, অসীম আকাশের অগণ্য গ্রহনক্ষত্র কেহই অতিক্রম করিতে পারিতেছে না—"তদু নাত্যেতি কশ্চন।"

বিশ্বস্রষ্টা পরমেশ্বর শোভার আগার এই জগতে জন্ম, বৃদ্ধি ও মৃত্যু—তিনেরই স্রোত প্রবাহিত করিয়া দিয়াছেন। এক দিকে তাঁহার যেমন পিতৃভাব, মাতৃবাৎসল্য, তেমনি আর একদিকে তিনি "মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতং।" তিনি আমাদের চক্ষুকে জ্ঞানের দ্বার করিয়া দিয়া-ছেন। আমরা জগৎ দেখিয়া তাঁহার ইচ্ছা পাঠ

করিতেছি এবং তাঁহার স্নেহ করুণা অনুভব করিয়া তাঁহার চরণে প্রীতিপুষ্প অর্পণ করিতেছি; প্রেমভরে তাঁহার উপাসনা করিতেছি। যে আনন্দ আমরা অনুভব করিতেছি, তাহা অন্যকে না বলিয়া কোন মতেই শান্তিলাভ করিতে পারিতেছি না। এইরূপে ঈশ্বরের পবিত্র নাম দেশবিদেশে বিঘোষিত হইতেছে; চারিদিকেই তাঁহার পবিত্র ধর্ম্ম প্রচারিত হইতেছে।

দ্বিতীয় উপদেশ—পৃথিবী।

(১৮ই ফাল্গুন, রবিবার, ব্রাহ্মসম্বৎ ৬১, ১৮১২ শক।)

এই যে অগণ্য নক্ষত্র * অসীম আকাশে ভ্রাম্যমাণ, আমাদের পৃথিবী তাহাদের মধ্যে একটী সামান্য গ্রহমাত্র। আবার উহার মধ্যে

* এক একটা নক্ষত্র এক একটী সূর্য্য।

তুমি এত ক্ষুদ্র যে গণনার মধ্যে আইস না। আমরা পৃথিবীর ক্ষুদ্র কীট হইলেও আমাদের কত উচ্চ অধিকার। ঈশ্বর কেবল আমাদিগকেই তাঁহাকে জানিবার অধিকারী করিয়াছেন। “সূর্য্য যাঁহার মহাসভার সামান্য একটী জ্যোতিষ্মান্ বিন্দু, তাহার মধ্যে আপনাকে বড় দেখা বিনয়ের নিতান্ত বহির্ভূত”(হাফেজ)। মান অভিমান পরিত্যাগ করিয়া বিনীত ভাবে, কাতর প্রাণে তাঁহার দিকে অগ্রসর হও, তবে তাঁহাকে প্রাপ্ত হইবে।

এই যে অসীম আকাশে অগণ্য নক্ষত্র ঘুরিতেছে, তাহাদের পরস্পরের মধ্যে একটী ঘনিষ্টতম যোগ রহিয়াছে, তাঁহার পালনীশক্তি এমনি আশ্চর্য্য! তাহারা সকলে মিলিয়া একটি যন্ত্র—ঈশ্বর শঙ্কুস্বরূপ হইয়া সমুদয় ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। এই পৃথিবী একটা সুপ্রকাণ্ড বেলুন যন্ত্র। পৃথিবীর দ্রুতগতির বিরাম নাই। ইহার উপরে ভূলোকনিবাসী

যাবতীয় জীবগণ আপনাপন অন্ন পান লাভ করিয়া সুখে কালযাপন করিতেছে, ইহা হইতে পতনের আশঙ্কা নাই। তাঁহার কৌশল কি আশ্চর্য্য!

এই পৃথিবী অতি পূর্ব্বে একটী সুপ্রকাণ্ড অগ্নিগোলক ছিল। জীবজন্তু ওষধি প্রভৃতির চিহ্ন মাত্র দেখা যাইত না। ক্রমে পৃথিবীর গাত্রে আচ্ছাদন (Crust) পড়িল। ভিতরে প্রচণ্ড অগ্নি—উত্তপ্ত দ্রবধাতু; বাহিরে অগ্নিময় অপেক্ষাকৃত কঠিন আবরণ। সূর্য্যও তখন ঘোর বাষ্পময় মেঘে আবৃত। অগ্নির উত্তাপে পৃথিবী হইতে বারংবার বাষ্প উত্থিত হইয়া পুনরায় জলরূপে পড়িতে লাগিল। এই সময়ে পৃথিবীর মধ্যে অতিশয় গোলমাল চলিতেছিল। একদিকে যেমন ঘোরতর বৃষ্টি পড়িতে লাগিল, তেমনি আবার আগ্নেয় গিরি জ্বলন্ত অগ্নি উদ্গীরণ করত পৃথিবীর আচ্ছাদন ভেদ করিয়া উঠিতে লাগিল; চতুর্দ্দিকে ভয়া-

নক ভূমিকম্প হইতে লাগিল; কতক স্থান বা উপরে উঠিয়া উচ্চশৃঙ্গ পর্ব্বত হইল; কতক স্থান বা নিম্নে চলিয়া গিয়া দূরপ্রসারিত গভীর গহ্বর হইয়া জলের আধার মহাসমুদ্র হইল। পৃথিবী জল ও স্থলে বিভক্ত হইয়া ক্রমে শীতল হইয়া আসিতে লাগিল।

এইরূপে যুগযুগান্তর চলিয়া গেল। ক্রমে কীটাণু শঙ্খ প্রভৃতি জলজন্তুর সৃষ্টি আরম্ভ হইল। পরে পরে মকর, কুম্ভীর প্রভৃতি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড জলজন্তুর সৃষ্টি হইল। তাহার পরে যখন ক্রমে স্থলভাগ অরণ্যময় হইয়া উঠিল, তখন আবার সেই অরণ্যের উপযুক্ত সুপ্রকাণ্ড হস্তী (mammoth) প্রভৃতির উৎপত্তি হইল। কিন্তু তখনও অগ্ন্যুৎপাতের বিরাম নাই- ভূগর্ভস্থ দ্রব ধাতু সমূহের আলোড়নে উচ্চ-স্থান নিম্ন হইতে লাগিল, নিম্নস্থান উচ্চ হইতে লাগিল; পর্ব্বত সমুদ্রে ডুবিয়া যাইতে লাগিল এবং সমুদ্রতলস্থ নিম্নভূমি পর্ব্বত

হইতে লাগিল। সেই যুগপরিবর্ত্তন কালের ঘোর মহাপ্রলয়কাণ্ডের নিদর্শন বহুশতাব্দী পরে আজও আমরা প্রত্যক্ষ করিতেছি। হিমালয়-সমান অভ্রভেদী পর্ব্বতের উন্নততম চূড়ায় আজও আমরা সমুদ্রজাত জীবজন্তুর অস্থি-আবরণ বিস্তর দেখিতে পাই। এই সময়ে প্রচণ্ড বাত্যার প্রভাবে বৃক্ষরাজি নির্ম্মূল হইয়া ভূপৃষ্ঠে নিপতিত হইল এবং ভবিষ্যতে পাথুরিয়া কয়লারূপে মনুষ্যের অশেষ উপকার সাধন করিবার জন্য প্রোথিত রহিল। সমুদ্র-স্থিত শঙ্খপ্রবাল স্থানে স্থানে মৃত হইয়া রাশী-কৃত হইতে লাগিল; আবার তাহাদের সন্তান সন্ততি ঐ গুলির উপরেই প্রাণত্যাগ করিয়া প্রবালস্তূপ পরিবর্দ্ধিত করিতে লাগিল এবং এইরূপে ক্রমে ক্রমে প্রবাল দ্বীপে পরিণত হইল। ক্রমে ওষধি বনস্পতির জন্ম, জীবজন্তুর আবির্ভাব নূতন শোভায়, নূতন সৌন্দর্য্যে পৃথিবীকে আলোকিত করিয়া তুলিল। অগ্নি-

ময় গোলক হইতে এই শোভন সুন্দর পৃথিবীর সৃষ্টি। কি আশ্চর্য্য কৌশল এই মর্ত্ত্যলোককে শোভাসৌন্দর্য্যে ভূষিত করিল।

এইরূপে কত যুগ গিয়াছে, তবে এই পৃথিবী বর্ত্তমান অবস্থায় আসিয়াছে। পৃথিবীর বর্ত্তমান অবস্থা দেখিয়া স্পষ্টই বোধ হয় যে, যেমন উত্তর আমেরিকার সহিত দক্ষিণ আমেরিকা সংযুক্ত আছে, সেইরূপ পূর্ব্বে ইউরোপের সহিত আফ্রিকার, এসিয়ার সহিত অস্ট্রেলিয়ার সংযোগ ছিল। যেন সকল দেশ একত্রিত হইয়া এক মহাদেশ বিদ্যমান ছিল। ক্রমে ভূমিকম্পের আক্রমণে নূতন পর্ব্বতের জন্ম হইল। জল সমূহ অপেক্ষাকৃত নিম্ন ভূভাগে প্রবেশ করিয়া আফ্রিকাকে ইউরোপ হইতে, অস্ট্রেলিয়াকে এসিয়া হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিল।

আলোককিরণের পরীক্ষায় যতটুকু উপলব্ধি হয়, ধূমকেতুস্থ পদার্থের বিশ্লেষণে যাহা

দেখা যায়, তাহা হইতে নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে যে, পৃথিবীতে যে সকল ধাতু আছে, তাহার অনেকগুলিই সূর্য্যেও বর্ত্তমান। ঈশ্বরের সৃষ্টিপ্রণালী, বিশ্ব-রাজ্যের চারিদিকে একইরূপ; কিন্তু এই ঐক্যের মধ্যে তিনি বিচিত্রতার সঞ্চার করিয়া দিয়াছেন। যেমন বৃহস্পতির চারি চন্দ্র। বৃহস্পতি সূর্য্য হইতে বহুদূরে আছে বলিয়া এক চন্দ্রে তাহার অন্ধকার বিদূরিত হয় না এবং এই চন্দ্রগুলিও সূর্য্য হইতে অনেক অন্তরে স্থিত বলিয়া নিজেও বেশী জ্যোতিষ্মান্ নহে। এই জন্য পৃথিবীকে এক জ্যোতিষ্মান্ চন্দ্র দিয়া বৃহস্পতিকে চারি ক্ষীণজ্যোতি চন্দ্র দিলেন এবং উভয় গ্রহের আলোকের সমতা রক্ষা করিলেন। সূর্য্য হইতে দূরস্থিত মন্দগামী শনিগ্রহের তিনটী আলোকময় পরিধি দিয়া তাহাকে উজ্জ্বল করিলেন। এই পরিধি আর কিছুই নহে, কেবল চন্দ্র সমূহের সমষ্টি মাত্র। সেই

অসংখ্য চন্দ্রের কিরণে সেখানে কি না জানি শোভা—যেন তিনটী দীপমালার দ্বারা বেষ্টিত হইয়াছ। এক চন্দ্রের যে আলোকে পৃথিবীর অন্ধকার দূর হইল, চারি চন্দ্রের সেই আলোকে বৃহস্পতির অন্ধকার দূর হইল, আবার চন্দ্র সমষ্টির তিনটী আবর্ত্তনে শনিগ্রহের অন্ধকার দূর হইল। দেখ, ঈশ্বরের রাজ্যে চারিদিকে সমতা রক্ষা করিবার জন্য কেমন বিচিত্রতা বর্ত্তমান। একের অভাব তিনি অন্য সকল দ্বারা কেমন পূর্ণ করিতেছেন—আলোকের পরিবেশন তাহার উপমা। সৃষ্টির মধ্যে তাঁর মঙ্গল ইচ্ছা অবিশ্রান্ত কার্য্য করিতেছে। তিনি তাঁর সেই মঙ্গল ইচ্ছা আপনি নিত্যই জানিতেছেন।

প্রেমের আকর করুণাময় পরমেশ্বর মনুষ্যজাতিকে পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বোপরি স্থাপন করিয়া তাঁহার কি আশ্চর্য্য মহিমা প্রকাশ করিয়াছেন। তাহার উপকারের জন্য কত

প্রকার বৃক্ষলতা সৃজন করিলেন; দেশভেদে কত ফলফুলের বিচিত্রতা সম্পাদন করিলেন; ঔষধের জন্য কত লতাগুল্ম সৃজন করিলেন; সংসারের বহু উপকারী লৌহ প্রভৃতি কত ধাতু এবং শোভা সৌন্দর্য্য সাধনের জন্য কত বিচিত্র রত্ন-রাজির ভাণ্ডার ভূগর্ভে নিহিত করিয়া দিলেন। কি আশ্চর্য্য তাঁহার দয়া! কি অনুপম তাঁহার করুণা।

তৃতীয় উপদেশ—অন্নময়কোষ।

(২৫সে ফাল্গুন, ১৮১২ শক, ৬১ ব্রাহ্ম সম্বৎ, রবিবার।)

সেই অনাদি সনাতন পরব্রহ্ম আপনার সৌন্দর্য্যে আপনিই মগ্ন আছেন। এই সৌন্দর্য্যের কণামাত্র জগতের সমস্ত শোভা সম্পাদন করিয়াছে। তিনি আপনার জ্ঞান, আপনার প্রেম, আপনার মঙ্গল ইচ্ছা আপনি নিত্যই জানিতেছেন। যখন অপরের ইচ্ছা তাঁহার

কার্য্য বা বাক্য দ্বারা প্রকাশ না হইলে বুঝিতে পারি না, তখন তাঁহার ইচ্ছা তাঁহার এই জগতের কার্য্য না দেখিয়া জানিব কি প্রকারে? তাঁর সেই মঙ্গল ইচ্ছার পরিচয় এই জগৎ; এই জগতেই বুঝিতে পারিতেছি যে তাঁহার ইচ্ছা কিরূপ। এই জগৎ সংসার দেখিয়া তাঁর জ্ঞান যতটুকু বুঝিতে পারি, তাহার পর ভাবি যে আরও কত জ্ঞান আছে—সে জ্ঞানের অন্ত নাহি! এই জগৎসংসার দেখিয়া তাঁর জ্ঞান উপলব্ধি করি।

প্রেম এই জগতের কোন্ স্থানে না আছে? জগতই তাঁহার প্রেমের পরিচয়, তাঁহার মঙ্গলভাবের পরিচয়। আমরা জ্ঞানের দ্বারা জানিতেছি যে তিনি জ্ঞানে পূর্ণ; আবার তাঁহার সেই জ্ঞানের-কার্য্য জগতে প্রত্যক্ষ দেখিলাম, তাঁর আশ্চর্য্য সৃষ্টিকৌশল বুঝিতে পারিলাম; —পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম যে, এই সমস্ত জগৎ আমারই দেবতার জ্ঞান প্রকাশ করি-

তেছে। এইখানে জ্ঞান ও প্রত্যক্ষে মিলিয়া গেল। মঙ্গল ইচ্ছার পরিচয় এই জগতেই রহিয়াছে। যতটুকু জানিতে পারিয়াছি; আর যতটুকু জানিতে পারি নাই, তাহা তিনি আপনিই জানেন।

তাঁহার ইচ্ছার পরিচয় এই যে, সৃষ্টির সময়ে তিনি এই অসীম আকাশে আপনার শক্তি বিস্তৃত করিয়া দিলেন। ইহাই তাঁহার ইচ্ছা। তিনি আপনার শক্তি আকাশে ব্যাপ্ত করিয়া দিয়াছেন! সেই যে শক্তি—সেই এই জড় জগৎ, এই জড় জগৎ আকাশে রহিয়াছে। জড় জগতের প্রথম গুণ দুইটী—বিস্তৃতি ও বাধকতা; এই দুইটী গুণ জড় জগতের সঙ্গে ওতপ্রোত হইয়া রহিয়াছে। ঈশ্বর জড় জগতের এই দুইটী বিশেষ গুণ ব্যতীত আরও যে পাঁচটী অবান্তর গুণ দিয়াছেন—রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ, তাহাও আশ্চর্য্য। জড় জগৎ তাঁর ইচ্ছাতেই এই পাঁচ গুণ পাইয়াছে, তিনিই

সব দিয়ে দিয়েছেন। রূপ ও অবয়ব সকল দেখ, কি সুন্দর। আদি সৌন্দর্য্য তাঁহাতে আছে, তাঁহার সেই সৌন্দর্য্য হইতেই এই সমস্তই সুন্দর হইয়াছে। ফুলেতে ছোট ছোট কেশর আছে, তাতে কি রকম আশ্চর্য্য গন্ধ রহিয়াছে। এই যে জগৎ, সেও তাঁহার সেই আদিম অসীম শক্তি পায় নাই, সে শক্তি তাঁহাতেই পূর্ণরূপে রহিয়াছে—ইহাই তাঁহার মহিমা।

তাঁহার শক্তি হইতে জড় জগৎ হইয়াছে। শক্তি আপনাপনি আইসে নাই—ঈশ্বরের শক্তি হইতে এই জড় জগৎ ও জড় জগতের শক্তি আসিয়াছে। যখন এই সমস্তই তাঁহার শক্তি, তখন যাঁহা হইতে এই সকল আসিয়াছে, তাঁহাকে ছাড়িয়া কি তাঁহারা থাকিতে পারে? আশ্রয় ছাড়িয়া কি আশ্রিত থাকিতে পারে? অতএব ইহা প্রতীতি হইতেছে যে, আকাশে বিস্তৃত এই সমুদায় জগৎ তিনি ধারণ করিয়া রহি-

য়াছেন; এই সকলই তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া রহিয়াছে। অতএব তিনি সর্ব্বগত, সর্ব্বব্যাপি; তিনি অগ্নিতে আছেন, তিনি জলেতে আছেন, তিনি ওষধি বনস্পাতিতে আছেন; তিনি সকল জগতেই প্রবিষ্ট হইয়া আছেন।

যিনি জ্ঞান-গোচর, তাঁহাকে যদি প্রত্যক্ষ করিতে চাও, তবে নয়ন খুলিয়া দেখ, তাঁহাকে জগতে প্রত্যক্ষ করিবে; যদি অন্তরে দেখিতে চাও, তবে নয়ন নিমীলিত করিয়া দেখ, তাঁহাকে ধ্যানে সাক্ষাৎ পাইবে। ঈশ্বর যিনি, যাঁহাকে লোকে খুঁজিয়া পায় না, ব্রহ্মপরায়ণেরা তাঁহাকে চক্ষু খুলিলেও দেখিতে পান, চক্ষু মুদ্রিত করিলেও দেখিতে পান। জ্ঞানীদিগের উপদেশ এই যে, তাঁহাকে সকল স্থানেই দেখিবে এবং স্বীয় আত্মাতে দেখিবে—অন্তরে বাহিরে তাঁহাকে দেখিবে। এই যে জড় জগৎ, বেদে ইহাকেই অন্নময় কোষ বলিয়াছেন।

চতুর্থ উপদেশ—প্রাণময় কোষ।

(৯ই চৈত্র, ১৮১২ শক, রবিবার ৬১ ব্রাহ্মসম্বৎ।)

তাঁহার ইচ্ছাতে ক্রমে পৃথিবী প্রশান্ত হইল। সূর্য্য প্রকাশিত হইল; এতদিন যে তাহার বাষ্প আবরণ ছিল, তাহা ক্রমে অপসারিত হইল। পরিমিতরূপে রৌদ্র হইল, পরিমিতরূপে বৃষ্টি হইল। এ সকল কেন হইল? তাঁহার লক্ষ্য কি? পৃথিবীতে প্রাণসৃষ্টিই তাঁহার লক্ষ্য। এই যে পৃথিবী এমন প্রশান্ত হইল, শৈবালক অবধি বটবৃক্ষ পর্য্যন্ত বৃক্ষসকল উৎপন্ন হইল, এই সকলই তাঁহারই ইচ্ছাতে।

এই যে প্রাণের সৃষ্টি হইল, প্রাণ কোথা হইতে আসিল? ইহা কি আপনাপনি আসিয়াছে? যেমন পূর্ব্বে বলিয়াছি যে ঈশ্বর আপনার শক্তি সমুদয় আকাশে ব্যাপ্ত করিয়া দিয়া অন্নময় কোষ সৃষ্টি করিলেন, সেইরূপ সেই মহাপ্রাণ প্রাণকে বৃক্ষমূলে স্থাপিত

করিয়া প্রাণময় কোষের সৃষ্টি করিলেন। প্রাণের ক্রিয়া, প্রাণন শক্তি জড়জগতের শক্তি হইতে কত বিভিন্ন।

এই জড় জগতে যে সকল শক্তি আছে, তাহাতেই তাঁহার জ্ঞানের পরিচয়; প্রধানতঃ সেই সকল শক্তি দুই—আকর্ষণ ও বিয়োজন। এই দুই শক্তির বলেই জড় জগৎ চলিতেছে; এই দুই শক্তিতেই জড় জগতের গতি, এই দুই শক্তিতেই জড় জগতের স্থিতি।

"দেবস্যৈষ মহিমা তু লোকে যেনেদং ভ্রাম্যতে ব্রহ্মচক্রং।"

এই যে ব্রহ্মচক্র ঘুরিতেছে, ইহাই সেই পরমদেবের মহিমা। এই যে ক্ষুদ্র বৃহৎ পঞ্চাশটী গ্রহগণ আমাদিগের এই পৃথিবীর সঙ্গে এই সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিতেছে, এই সূর্য্য ঐ গ্রহগণের সহিত আবার আর এক সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিতেছে;—সেই সূর্য্য আমাদিগের এই সূর্য্য হইতে কত বৃহৎ। আবার সেই সূর্য্য তাহার চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণকারী গ্রহগণের

সহিত আরও বৃহৎ এক সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিতেছে। এইরূপে অগণ্য সূর্য্য আকাশে পরিভ্রমণ করিতেছে--ইহার অন্ত কোথায়, ইহার অন্ত কোথায়! আমাদিগের এই পৃথিবী যে আকাশের মধ্যদিয়া একবার গমন করিয়াছে, সে আকাশে আর সে ফিরিয়া আসিতে পারিবে না।

এই তো গেল জড়ের শক্তি। কিন্তু প্রাণন শক্তি, সে আবার আরও আশ্চর্য্য; সে শক্তি জড়ের বিপরীত শক্তি, সে শক্তি জড়শক্তিকে অতিক্রম করিয়া চলে। একটা গাছ জন্মাইল; এই গাছের যতটা পত্তনভূমি আবশ্যক, প্রাণনবলে ততটা ভূমিতে তাহার মূল বিস্তৃত হইয়া প্রবেশ করিল এবং তাহারই উপরে গাছটী স্থিরভাবে দণ্ডায়মান রহিল। এইরূপে গাছ প্রাণনবলে আপনার উপযুক্ত পত্তনভূমি আপনিই প্রস্তুত করিতেছে। তাহার যতটা নীচে যাইবার প্রয়োজন, ততটা নীচে গেল,

আবার যতটা উপরে যাইবার প্রয়োজন, ততটা ঊর্দ্ধে গেল। আবার দেখ, তালগাছ নারিকেল-গাছ প্রভৃতি প্রাণন-শক্তির বলে পৃথিবীর আকর্ষণ-শক্তিকে অতিক্রম করিয়া কৈশিক আকর্ষণের দ্বারা কত ঊর্দ্ধে রস লইয়া যাই-তেছে এবং কত ঊর্দ্ধে আপনাপন ফল প্রস্তুত করিয়া লইতেছে। এইরূপে প্রাণন-শক্তি অন্নময় কোষে প্রবেশ করিয়া তাহাকে গড়ায়। প্রাণ থাকিতে গেলেই অন্ন আবশ্যক, সেই অন্ন পৃথিবীতে আছে; প্রাণ এই পৃথিবী হইতে অন্নরস গ্রহণ করিয়া আপনাকে পুষ্ট করিতেছে। এই প্রাণ যে অন্নময় কোষকে গড়াইতেছে, সে কি জানে যে কি রূপে গড়া-ইতেছে? সে তো এক অন্ধশক্তি, কিন্তু কি আশ্চর্য্যরূপে গড়াইতেছে। ঈশ্বর যে গাছের যে আদর্শ দিয়াছেন, সেই গাছ সেই অনু-সারেই কেমন বাড়িতেছে। বিশেষ বীজ হইতে যে বিশেষ গাছ হইবে, ইহা, যাঁহার

ইচ্ছায় বিশেষ গাছ হইয়াছে, তিনিই জানেন যে কি রূপে হইবে।

এই যে অন্নময় কোষ পৃথিবী, প্রাণ বৃক্ষকে গড়াইবার ও বাড়াইবার জন্য তাহা হইতে রস আকর্ষণ করে; কিন্তু দেখ কি আশ্চর্য্যরূপে এই কার্য্য হইতেছে। এই অন্ন সংগ্রহ করিবার নিমিত্ত বৃক্ষমূল সকল যেখান হইতে রস প্রাপ্ত হয়, সেই খানেই গমন করে; এমন কি, মধ্যে যদি প্রস্তর ব্যবধান থাকে, তবে তাহাও ভেদ করিয়া গিয়া সরস ভূমিতে পৌঁছিয়া রস আকর্ষণ করিয়া থাকে। ইহাই আশ্চর্য্য যে সামান্য বৃক্ষমূল প্রস্তর পর্য্যন্ত ভেদ করিতে পারে। এইখানে ঈশ্বরের ইচ্ছা, ঈশ্বরের জ্ঞান একটী গাছে দেখিতে পাই-তেছি! তাঁহার ইচ্ছা কে জানিবে? আবার দেখ যে, প্রাণের উপকরণ কতগুলি চাই। এক উপকরণ মাটী তাহা শুষ্ক হইলে হইবে না; জল চাই, জল ও মাটী একত্র হইলে

তবে রস হয় ; ইহার উপর আবার তেজ চাই, বাতাস চাই, আলো চাই। এতগুলি উপকরণ একত্রে হইলে তবে একটী গাছ হয়। তাহাদের একটা যদি না থাকে, তবে আর গাছ হইতে পারে না ;—এই গুলি কে সংযোগ করিয়া দিলেন ?

এই সৌর জগৎ সূর্য্যের চারিধারে ঘুরিতেছে। সূর্য্য যদি আর একটু নিকটে থাকিত, তাহা হইলে পৃথিবী জ্বলিয়া যাইত ; যদি আরও দূরে যাইত, তাহা হইলে পৃথিবী শীতল হইয়া পড়িত। এই জন্য সূর্য্যের তেজ ঠিক উপযুক্ত রূপে আসিতেছে, তাই প্রাণ বাঁচিতেছে। এই একটা জ্ঞানের কেমন পরিচয়। কেন সেই পূর্ণ পুরুষ সূর্য্যকে এতটা দূরে রাখিলেন ? দেখ, এক সূর্য্য ঠিক্ উপযুক্ত দূরে রহিল—তেজের পরিমাণ হইল, প্রাণও বাঁচিতে লাগিল। ইহা জ্ঞানেরই কার্য্য ; অন্ধ শক্তি দ্বারা হয় নাই। বাতাসের আবশ্যক,

চলাচল না হইলে বাতাস বহে না ; ঐ এক সূর্য্যের তেজ লাগিয়া বাতাস চলিতেছে। জল চাই, মেঘ না হইলে বৃষ্টি হইবে না ; ঐ এক সূর্য্যের তেজ লাগিয়া বাষ্প উত্থিত হইয়া মেঘ হইল এবং মেঘ হইতে বৃষ্টি পড়িয়া মৃত্তিকা সরস হইল। ঈশ্বর এক সূর্য্য নির্ম্মাণ করিয়া দেওয়াতে বাতাস চলিতেছে, বৃষ্টি হইতেছে, মৃত্তিকা কার্য্যের উপযুক্ত হইতেছে। আলো যদি না থাকিত, সমস্ত গাছের পাতা বিবর্ণ হইয়া যাইত। এই চারি বস্তুই এক সূর্য্যের উপর নির্ভর করিতেছে ; সূর্য্য না থাকিলে কিছুই হয় না। তাঁহার রচনায় কেমন একটা সরল ভাব ; যতগুলি জিনিসের দরকার, এক সূর্য্যই সেই সমস্তের প্রধান কারণ—এক সূর্য্য দেওয়াতে প্রাণ চলিতেছে। প্রকৃতির এক পদও এদিক ওদিক নড়িবার উপায় নাই—সমস্তই সেই বিশ্বপিতার শাসনে চলিতেছে।

"ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াত্তপতি সূর্য্যঃ
ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্দ্ধাবতি পঞ্চমঃ ।"

তাঁহারই শাসনে সূর্য্য উত্তাপ দিতেছে, বৃষ্টি হইতেছে, বায়ু চলিতেছে এবং তাহাতেই প্রাণ বাঁচিতেছে।

এক প্রাণন কার্য্য দ্বারাই ঈশ্বরের জ্ঞান ও ইচ্ছা কেমন স্পষ্ট প্রকাশ পাইতেছে; তাঁহার মহিমা আমরা কেমন সহজে জানিতে পারিতেছি। এই বিশ্বযন্ত্র নিয়মে চলাতেই প্রাণ থাকিতে পারিয়াছে। প্রাণের উপকরণ ক্ষিত্যপ্‌তেজোমরুৎ—আকাশ ব্যবধান মাত্র। এই উপকরণ কি প্রকারে হইয়াছে, তাহা আমরা পরীক্ষার দ্বারা জানিতে পারিয়াছি। মনে কর জল; ইহা হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন মিলিত হইয়া প্রস্তুত হইয়াছে। আবার যে বাতাস আমরা স্পর্শ করিতে পারি না, সেই বাতাস তাহা অপেক্ষাও সূক্ষ্ম পদার্থ অক্সি-জেন ও নাইট্রোজেন হইতে প্রস্তুত হইল।

স্থূলভাবে দেখিতে গেলে দেখিতে পাই যে এই পৃথিবীতে প্রধানতঃ ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ এই চারি বস্তু বিদ্যমান আছে, কিন্তু যখন আরো সূক্ষ্মভাবে দেখিতে চাই, তখন দেখি যে পৃথিবীতে প্রধানতঃ অক্সিজেন, নাই-ট্রোজেন, হাইড্রোজেন ও কার্ব্বন এই চারি সূক্ষ্ম পদার্থ বিদ্যমান আছে। এই সকলে ঈশ্বরের জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। আমরা বলিতে পারি যে অক্সিজেন ও হাইড্রোজেন মিলিত হইয়া জল হইল; অক্সিজেন ও নাই-ট্রোজেন মিলিত হইয়া বায়ু হইল; কিন্তু কেন হইল, তাহা কে জানে? এ গুলি না হইলে প্রাণ থাকিতে পারে না।

ঈশ্বর যে এই সকল উদ্ভিজ্জ সৃষ্টি করিয়াছেন, এই সকলে কেমন ক্রমোন্নতির পরিচয় পাওয়া যায়—সব ক্রমে হইতেছে, একেবারে কিছুই হয় না। শৈবালক অবধি বটবৃক্ষ পর্য্যন্ত সব ক্রমোন্নতির দৃষ্টান্ত। প্রথম দেখ

যে বরফ সব শ্বেতবর্ণ রহিয়াছে, ক্রমে একটু-খানি হল্‌দে বর্ণ-বিশিষ্ট হইল, তাহার পরে সমুদয় বরফের ক্ষেত্র একেবারে হল্‌দে হইয়া গেল। কি প্রকারে এই বরফ হল্‌দে হইয়া গেল? বরফের উপর এক প্রকার শৈবাল হয়; এই শৈবালের বর্ণে বরফ রঞ্জিত হইয়া গিয়াছে। বৃক্ষজাতির মধ্যে দেখ, প্রথমে শৈবাল হইল। তাহার পরে তদপেক্ষা উন্নত হইল তৃণগুল্ম প্রভৃতি; আবার তাহা হইতে উন্নত (fern প্রভৃতি) শাখাপ্রশাখাবিহীন বৃক্ষ। ক্রমে শাখাপ্রশাখাবিশিষ্ট বৃক্ষ দেখিতে পাই-লাম, তাহাদের আর ফুল ফল হয় না। ক্রমে ক্রমে কেবল ফুলের গাছ হইতে লাগিল, তাহার পরে ফুলফলশোভিত আম্রাদি বৃক্ষ দেখিতে পাইতেছি। বৃক্ষের কেমন ক্রমো-ন্নতি দেখিলাম। এই সকলেরই লক্ষ্য আছে, উদ্দেশ্য আছে; বিনা লক্ষ্যে কিছুই উৎপন্ন হয় নাই।

এই উদ্ভিজ্জের মধ্যে বিচিত্রতাও কত দেখা যায়। গ্রীষ্ম-প্রধান দেশে একরকম, শীত-প্রধান দেশে আর একরকম; গ্রীষ্ম-প্রধান দেশে নারিকেল প্রভৃতি সরস ফল, শীত-প্রধান দেশে বাদাম পেস্তা প্রভৃতি। এখানে নারিকেল কেন, ওখানেই বা পেস্তা বাদাম কেন; আর বরফের উপরে শৈবালই বা কেন? সকলেরই লক্ষ্য আছে। এই সকল দেখিয়া জানিতেছি যে জগতে ক্রমোন্নতি ও বিচিত্রতা আছে।

অন্নময় কোষের মধ্যে প্রাণ চলিয়াছে। প্রাণ কি শূন্যে শূন্যে থাকিতে পারে? অন্নময় কোষের মধ্যেই প্রাণ রহিল; গাছের মধ্যেই প্রাণ থাকিল—পৃথক্ থাকিবে কি প্রকারে? এতক্ষণ যে প্রাণময় কোষের কথা বলিয়া আসিলাম, তাহা স্থাবরের বিষয়; এই স্থাবর পাদপ ঝড় জল সহ্য করিয়া এক স্থানেই রহিয়াছে। ঈশ্বর কেমন কৌশল করিয়া

দিয়াছেন, যাহাতে পাদপজাতি একস্থানে থাকিয়াই প্রাণরক্ষা করিতে পারে। আর এই গাছের আয়ুই বা কত—আমেরিকায় একশত দুই শত বৎসরেরও গাছ আছে। আমেরিকাতে কেন? আমাদের দেশের বটগাছ জীবজন্তুকে ছায়া প্রদানের জন্য পাঁচ শত বৎসর পর্য্যন্তও বাঁচে।

আবার প্রাণ বীজে যে থাকে, সে বড় আশ্চর্য্য। ছোলা শুষ্ক আছে, একটু জল দিতে থাকিলেই তাহা হইতে অঙ্কুর বাহির হইবে। এমন কি মিসর দেশে যে মমি (mummy, বহুকালের রক্ষিত মৃতদেহ) তাহার মধ্যে যে ধান্য প্রভৃতি শস্যের বীজ থাকে, তাহা জলে রাখিয়া দেখা গেল যে তাহা হইতে অঙ্কুর নির্গত হইল; আবার সেই অঙ্কুর-সহিত বীজ মাটীতে রোপণ করিয়া দেখা গেল যে তাহা হইতে ধানের গাছ হইল। একবার ভাবিয়া দেখ যে, প্রায় চারি হাজার

বৎসর যে বীজ মমির মধ্যে শুষ্ক হইয়া আছে, তাহা হইতেও প্রাণ বাহির হইয়া যায় নাই। কিন্তু এই প্রাণ স্বয়ং আইসে নাই। আপনা-পনি যে প্রাণ আসিতে পারে না, তাহা পরীক্ষায় জানা গিয়াছে। পরীক্ষার জন্য উত্তাপের দ্বারা জল হইতে জীবিত কীটাণু ও বীজ প্রভৃতির প্রাণ নষ্ট করিয়া, বোতলের মধ্যে বদ্ধ করিয়া দুই বৎসর কাল পর্ব্বত-শৃঙ্গে ফেলিয়া রাখা হইয়াছিল; কিন্তু এই দুই বৎসর পরে বোতল খুলিয়া দেখা গেল যে, তাহাতে কোন প্রাণীর লক্ষণ নাই। প্রাণ আপনি হয় না; যখন মহাপ্রাণ হইতে প্রাণ আইসে, তখনই প্রাণ জন্মায়;—প্রাণের হেতু সেই মহাপ্রাণ। জড় প্রাণকে ধারণ করে; কিন্তু প্রাণ সেই মহাপ্রাণ হইতে আসিয়াছে। যেমন তাঁহার শক্তি হইতে অন্নময় কোষ হইল, তেমনি তাঁহার ইচ্ছায় প্রাণ রহিল অন্নময় কোষে। জড়ের এমন শক্তি নাই

যে প্রাণকে প্রসব করে—তিনিই প্রাণ দিয়াছেন।

তাঁহার ইচ্ছা কে বুঝিবে, যে বলিতে পারে যে, কেমন করিয়া প্রথম গাছ উৎপন্ন হইল? উত্তপ্ত ভূমি যখন শীতল হইল, গাছ জন্মাইতে আরম্ভ হইল। কিন্তু প্রথম গাছ কোথা হইতে আসিল, সে তাঁহারই ইচ্ছা—সে কে বুঝিবে? যখন পৃথিবী উত্তপ্ত ছিল, তখন ধাতু পর্য্যন্ত গলিয়া যাইতেছে, তখন কি গাছ থাকিতে পারে? যখন পৃথিবী শীতল হইল, তখন তিনিই প্রথম গাছ সৃষ্টি করিলেন। প্রত্যেক বৃক্ষের কেমন আশ্চর্য্যরূপ আদর্শ করিয়া দিলেন যে, তাহার বীজে সেই আদর্শানুযায়ী শক্তি চিরকাল রহিল। সকলেরই আদি-মুল অন্বেষণ করিতে গেলে এক ঈশ্বরের ইচ্ছা ভিন্ন অন্য কোন হেতু বুঝা যায় না "নান্যোহেতুর্ব্বিদ্যতে"। তিনি আপনার ইচ্ছা আপনি জানেন; আবার আমরাও সৃষ্টির

কৌশল দেখিয়া তাঁহার ইচ্ছা বুঝিতে পারি। দেখ এই জড় ও প্রাণ আলোচনা করিয়া তাঁহার ইচ্ছা ও জ্ঞানের কত পরিচয় প্রাপ্ত হইলাম।

পঞ্চম উপদেশ—মনোময় কোষ।

(১৬ই চৈত্র, রবিবার, ৬১ ব্রাহ্ম সম্বৎ ১৮১২ শক)

অন্নময় কোষ ছাড়িয়া প্রাণ থাকিতে পারে না; তেমনি প্রাণ ছাড়িয়া মন থাকিতে পারে না। যেখানে মন আছে, সেইখানে প্রাণ আছে; আর উভয়ের আধার জড়ময় কোষ। পশুরাজ্যে (যেমন অশ্বে) যে প্রাণ আছে, সে শরীর গড়াইতে লাগিল; অশ্বের প্রাণ অন্ন-পানের রস গ্রহণ করিয়া অশ্বকেই নির্ম্মাণ করিতে লাগিল। কিন্তু যখন সেই অশ্বের প্রাণের উপাদান অন্ন আবশ্যক হইল, তখন আর অশ্ব, স্থাবর পাদপের মত এক স্থানে স্থির

থাকিয়াই আহার সংগ্রহ করিতে পারিল না; তাহাকে চলিয়া ফিরিয়া আহার সংগ্রহ করিতে হইল। এইখানে বিস্তর কৌশল—ইহারই জন্য তাহার ইন্দ্রিয় হইল; দেখিয়া শুনিয়া আহার সংগ্রহ করিতে হইবে তাই ঈশ্বর তাহাকে চক্ষুরাদি জ্ঞানেন্দ্রিয় দিয়াছেন; তাহাকে চলা প্রভৃতি নানা কর্ম্ম করিতে হইবে, তাই ঈশ্বর তাহার পদ প্রভৃতি নানা কর্ম্মেন্দ্রিয় করিয়া দিয়াছেন। ইহা ব্যতীত তাহার প্রাণ-রক্ষা করিবার জন্য জঠর পাকস্থলী প্রভৃতি মিলিয়া এক প্রাণযন্ত্র তাহার দেহের মধ্যে স্থাপিত হইয়াছে।

অশ্ব প্রভৃতি পশুগণ দেখিয়া শুনিয়া আপনার অন্ন সংগ্রহ করিয়া লইয়া আসিল। সেই অন্ন যখন উদরের মধ্যে গেল, তখনই রস প্রস্তুত হইল। বৃক্ষের প্রাণ যেমন ভূমি হইতে রস সংগ্রহ করিয়া বৃক্ষকে গড়িতে থাকে, তেমনি পশুর প্রাণ তাহার উদর হইতে রস

লইয়া পশুকেই গড়াইতে লাগিল। এই প্রাণ থাকাতেই প্রাণময় কোষের মধ্যে মন থাকিতে পারিয়াছে। প্রাণ যদি না থাকে, মনের কার্য্য সব বন্ধ হইয়া যায়। প্রাণের উপরে মন রহিয়াছে; পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করিতেছে। এই মনোময় রাজ্যই জন্তুরাজ্য; ইহাই জঙ্গম রাজ্য।

তৃণ প্রভৃতি অন্ন, যাহা উদরে স্থান পাইল, তাহাই লইয়া প্রাণ পশুর শরীরকে পোষণ করিতে লাগিল। কিন্তু ভাবিয়া দেখ যে, প্রথম যদি তৃণ গুল্ম প্রভৃতি প্রস্তুত না হইত, তবে পশুরা অন্ন সংগ্রহ করিয়া আপনাদিগকে পোষণ করিতে পারিত না। এইখানে জ্ঞানের লক্ষ্য দেখা যাইতেছে—সূর্য্য না থাকিলে যেমন গাছ প্রভৃতি থাকিতে পারিত না, সেইরূপ গাছ প্রভৃতি না থাকিলে জীব জন্তু থাকিতে পারিত না। ছোট কীটদিগের যেমন অল্প রসেই পর্য্যাপ্তি হয়, তেমনি হস্তী প্রভৃতি বড়

বড় পশুদিগের বিস্তর রস আবশ্যক; তাই ছোট ছোট কীটদিগের নিমিত্ত তৃণ প্রভৃতি হইল, আর বড় বড় পশুদিগের নিমিত্ত বড় বড় বৃক্ষ উৎপন্ন হইল। আবার ঈশ্বর বড় বড় পশুদিগকে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বৃক্ষ হইতে আহার সংগ্রহ করিবার উপযুক্ত অঙ্গও প্রদান করিয়াছেন; যেমন হস্তীকে শুণ্ড দিয়াছেন।

মনোময় কোষেও ক্রমোন্নতি দেখা যায়। প্রথমে কীটাণু; ক্রমে ক্রমে অঙ্গের উন্নতি হইল, মেরুদণ্ডবিহীন জন্তু হইল; ক্রমে আরও উন্নতি, মেরুদণ্ডবিশিষ্ট জন্তুর সৃষ্টি হইল। ইহার সঙ্গে সঙ্গে মাথার মস্তিষ্কেরও উন্নতি হইতে লাগিল। তৃণ বৃক্ষাদির যেমন ক্রমোন্নতি ও বিচিত্রতা, পশুরাজ্যেও সেইরূপ। এই সকলে ঈশ্বরের জ্ঞানের কেমন স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। সূর্য্য চন্দ্র প্রভৃতি যেমন প্রকৃতি-রাজ্যে কার্য্যকারণে বদ্ধ হইয়া কার্য্য করিতেছে, বৃক্ষলতা প্রভৃতি প্রাণীরাজ্য যেমন

প্রকৃতিরাজ্যে কার্য্যকারণে বদ্ধ হইয়া কার্য্য করিতেছে, সেইরূপ পশুপক্ষী প্রভৃতি মনোময় রাজ্যও প্রকৃতিরাজ্যে কার্য্যকারণে বদ্ধ হই-য়াই কার্য্য করিতেছে।

যত কিছু বলিতেছি, আর যাহা কিছু বলিব, তাহার বীজ এই যে, ঈশ্বর, তিনি আপ-নার মঙ্গল ইচ্ছা নিত্যই জানিতেছেন; এবং সেই ইচ্ছাতেই সকল জগত্‍ নিয়মিতরূপে নিয়ত চলিতেছে।

ষষ্ঠ উপদেশ—বিজ্ঞানময় কোষ।

(২৩শে চৈত্র, রবিবার, ৬১ ব্রাহ্ম সম্বৎ, ১৮১২ শক)

অসীম আকাশে গ্রহগণ সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিতে লাগিল; পৃথিবী জলে স্থলে বিভক্ত হইয়া গেল; পরিমিত-রূপে বৃষ্টি হইতে লাগিল; ক্রমে ক্রমে পৃথিবী জীবের আবাস-ভূমি হইল এবং স্থাবর জঙ্গম উৎপন্ন হইল।

অন্নময় কোষের মধ্যে প্রাণ কার্য্য করিতেছে; আবার মনোময় কোষ পশুপক্ষী, প্রাণকে অবলম্বন করিয়া ঈশ্বরের নিয়মে চলিতেছে। শরীর ছাড়িয়া প্রাণ থাকিতে পারে না; অন্ন ব্যতীত প্রাণ শরীরকে পোষণ করিতে পারে না। আবার শরীর না থাকিলে, প্রাণ না থাকিলে মন থাকিতে পারে না। অন্নময় ও প্রাণময় কোষে মন কার্য্য করে। বৃক্ষলতা জীবজন্তু প্রভৃতি সকলেতেই প্রাণ কার্য্য করিতেছে। কিন্তু ইহার অতিরিক্ত জীবজন্তুদিগের মন আছে। কিন্তু এই সকল ধাবিত হইয়া, নিযুক্ত হইয়া কার্য্য করিতেছে; সকলই যন্ত্রস্বরূপ হইয়া যন্ত্রীর ইচ্ছায় চলিতেছে। ইহাই সৃষ্টির শেষ তাৎপর্য্য হইল না, ইহাতে ঈশ্বরের চরম লক্ষ্য সিদ্ধ হইল না। তাঁহার লক্ষ্য জ্ঞানধর্ম্মের উন্নতি। শরীরে প্রাণ ও প্রাণে মন দিয়া তাহার উপরে ঈশ্বর এক জ্ঞানবিন্দু স্থাপন করিলেন; আপনার অনন্তজ্ঞান—সেই গভীর

অনন্তজ্ঞান, তাহা হইতে এক বিন্দু জ্ঞান প্রসব করিয়া এবং তাহা দ্বিধা করিয়া মনুষ্যের— স্ত্রীপুরুষের শরীরে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। সেই জ্ঞানবিন্দুতে তিনি বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মবৃত্তি-মূলক বিজ্ঞান দিলেন এবং জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়ের শক্তি প্রদান করিলেন। কাম, ক্রোধ, লোভ, লজ্জাভয়, স্নেহভক্তি, দয়াদাক্ষিণ্য প্রভৃতি যে সকল মানসিক ভাব, ঈশ্বর তাহা জ্ঞানের অধীন করিয়া দিলেন। জ্ঞান যখন আপনাকে আপনি জানে, তাহার নিকটে তাহার আত্মত্ব প্রকাশ পায়; সেই আত্মাতে বিজ্ঞান আছে এবং তাহার স্বাধীন ইচ্ছা আছে। ইহারই জন্য সে বিজ্ঞানাত্মা পুরুষ। ঈশ্বর যিনি, তিনি অজ আত্মা, অনন্ত-জ্ঞান পূর্ণ পুরুষ। এই অজ আত্মা বিজ্ঞানাত্মার স্রষ্টা, পাতা, প্রতিষ্ঠা। বিজ্ঞানাত্মাই বিজ্ঞানময় কোষ এবং সেই বিজ্ঞানময় কোষের মধ্যে অন্তর্যামীরূপে তাহার প্রতিষ্ঠা আনন্দময় পূর্ণপুরুষ

রহিয়াছেন। "হিরণ্ময়ে পরে কোষে বিরজং ব্রহ্ম নিষ্কলং" বিজ্ঞানজ্যোতির্ম্ময় কোষে নির্ম্মল নিরবয়ব ব্রহ্ম বিরাজমান আছেন।

জ্ঞানেন্দ্রিয় কর্ম্মেন্দ্রিয় দিয়া ঈশ্বর মনুষ্যের শরীর কি সুন্দররূপে গঠন করিয়া দিলেন। স্ত্রীপুরুষের যে শরীর, সে কি সুন্দর! ঈশ্বরের ইহাও ইচ্ছা যে তাঁহার সৃষ্টিতে সৌন্দর্য্য বর্ষণ করিবেন, তাই তিনি সৌন্দর্য্য বর্ষণ করিলেন। সূর্য্যচন্দ্র দেখ, বৃক্ষলতা দেখ, অশ্ব প্রভৃতি পশু দেখ, কি সৌন্দর্য্য ছাইয়া রহিয়াছে। সকলের অপেক্ষা মনুষ্যের—স্ত্রীপুরুষের শরীরে দেখ, কি অনুপম সৌন্দর্য্য দিয়াছেন। আবার শরীরকে কেমন আত্মার উপযোগী করিয়াছেন; সেই উপযোগিতা ভাবিতে গেলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। হস্তের একটী বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ না থাকিলে হস্তের কার্য্য অতি সংক্ষেপ হইয়া পড়িত। জন্তুরা তৃণগুল্ম আহার করিবে, তাহাদের মস্তক নিম্নমুখ হওয়া আবশ্যক, তাই তাহাদিগের

মস্তক নিম্নমুখ হইল; কিন্তু মনুষ্যের চক্ষু উপরের দিকে চাহিবে, দেখিবে অনন্ত আকাশ, তাই ঈশ্বর মনুষ্যের শরীর জ্ঞানের উপযুক্ত উন্নত শরীর করিয়া দিয়াছেন।

জ্ঞান বলিলেই তাহার ইচ্ছা চাই—জ্ঞানের শক্তি ইচ্ছা। জড়ের শক্তি কার্য্যকারণে বদ্ধ হইয়া গতিতে প্রকাশ পায়, কিন্তু জ্ঞানের শক্তি ইচ্ছা। এই ইচ্ছা লাভ করাতে মানুষ স্বাধীন হইয়া গিয়াছে। প্রকৃতির ইচ্ছা নাই। প্রথমে প্রাণপঙ্ক (১) সৃষ্ট হইল, তাহার পরে বৃক্ষলতা সৃষ্ট হইল; পরে জলজন্তু পশুপক্ষীর সৃষ্টি হইল। এইরূপে ক্রমে প্রথম মনুষ্য স্ত্রীপুরুষ সৃষ্ট হইল। যতক্ষণ পর্য্যন্ত তাহারা আপনাদিগকে পোষণ করিতে না পারিয়াছিল, যতক্ষণ তাহারা স্বীয় ইচ্ছামতে কার্য্য করিতে অক্ষম ছিল, ততক্ষণ পৃথিবীই তাহাদিগের মাতা ছিল। যখন তাহাদি-

(১) (protoplasm)

গের শরীর উপযুক্ত হইল, তখন তাহারা আপ-নাদিগের ইচ্ছানুসারে কার্য্য করিতে লাগিল; আপনার অভাব আপনাকেই পূরণ করিতে হইল। ঈশ্বর প্রথমে এমন স্থানে মনুষ্যকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন, যেখানে প্রচুর ফল বিদ্য-মান ছিল। যখন সেই প্রথম মনুষ্যের জ্ঞান প্রস্ফুটিত হইল, যখন 'আমি' বলিয়া জানিল, তখন সে আপনার ইচ্ছানুসারে ফল আহরণ করিতে লাগিল। ক্রমে বিজ্ঞানের প্রভাবে বুদ্ধি চালনা করিয়া সকল অভাব পূরণ করিতে লাগিল; ক্রমে ক্রমে জ্ঞানের স্ফূর্ত্তি হইতে লাগিল। প্রথমে সে ফল মূল খাইয়া পুষ্ট হইল, তাহার পরে তাহাকে পশুদিগের সহিত সংগ্রাম করিয়া আহার সংগ্রহ করিতে হইল। এমন স্তর দেখা গিয়াছে, যেখানে সংসারের প্রয়োজনীয় পরিমিত অনেক উপকরণ প্রস্তর-নির্ম্মিত—এইখানে দেখিতেছি বিজ্ঞানের কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। ক্রমে ক্রমে বিজ্ঞানের উন্নতি

হইয়াছে। এই প্রস্তরস্তরের অনেক পরে লৌহঅস্ত্র পাওয়া গিয়াছে, সুতরাং তখন অগ্নির আবিষ্কার হইয়াছে। মানুষ এই অবস্থায় অনেক উন্নত হইয়াছে।

সপ্তম উপদেশ—আর্য্য জাতি।

(৩০ শে চৈত্র, ব্রাহ্ম সম্বৎ ৬১, ১৮১২শক।)

মনুষ্যের নানা প্রকার মৌলিক গঠন (type) আছে—মঙ্গোলীয়, ককেশীয়, নিগ্রো ইত্যাদি। ইহাতেই বোধ হয় যে, স্থানে স্থানে বিভিন্ন প্রকার মনুষ্য সৃষ্ট হইয়াছিল। হিমালয়ের উত্তরে যে সমভূমি, সেখানে অনেক লোকের বসতি ছিল এবং তাহাদিগের মধ্যে কতকটা উন্নতিও হইয়াছিল; কৃষি বাণিজ্য বিস্তার হইয়াছিল; দেবতার উপাসনাও সেখানে চলিত ছিল—সূর্য্যের উপাসনা হইত, চন্দ্রের উপাসনা হইত। ক্রমে যখন তাহাদিগের

মধ্যে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি হইল, তখন তাহাদিগের পরস্পরের মধ্যে নানা প্রকার বিরোধ বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হওয়ায়, তাহারা দলে দলে চারিদিকে বহির্গত হইয়া পড়িতে লাগিল; কোনও দল ইউরোপে চলিল, কোনও দল বা পারস্য দেশে আশ্রয় গ্রহণ করিল; কোনও দল হিমালয় ভেদ করিয়া ভারতবর্ষে আসিয়া বসতি করিল। পারস্যদেশীয় ও এদেশীয়দিগের মধ্যে ধর্ম্ম লইয়া একটা বিবাদ ছিল—প্রধানতঃ দেব ও অসুর লইয়া; পারসীকগণ দেব শব্দকে অসুর অর্থে এবং অসুর শব্দকে দেবতা অর্থে প্রয়োগ করে। এই দুই জাতির মধ্যে যেমন উপাসনার সাম্য ছিল, বিবাদও তেমনি প্রবল ছিল।

ভারতবর্ষে যাহারা আসিল, তাহারাই আর্য্য নামে খ্যাত হইল। যখন হিমালয়ের উত্তরে সকলে অবিচ্ছিন্ন ভাবে বাস করিত, তখনও আর্য্য নাম ছিল; কিন্তু ভারতবর্ষেই

আর্য্য নামের কিছু বিস্তার হইয়াছে। আর্য্যেরা যখন এখানে প্রবেশ করিল, তখন তাহারা প্রথমে সিন্ধুনদীর তীর দিয়া, পরে হিমালয়ের নিকট দিয়া গঙ্গা বাহিয়া আসিতে লাগিল। ব্রহ্মাবর্ত্ত হইল সিন্ধুনদীর তীর, আর্য্যাবর্ত্ত হইল গঙ্গানদীর তীর। বেদে যেমন সিন্ধু-নদীর প্রশংসা আছে, সেইরূপ সিন্ধুনদীর পরে গঙ্গানদীরও প্রশংসা আছে; সরস্বতীর কথাও আছে—সরস্বতী নদী এখন শুকাইয়া গিয়াছে। এই তিন নদীই বেদে প্রশস্ত। বেদে নর্ম্মদা, কাবেরী প্রভৃতি নদীরও উল্লেখ আছে। ব্রহ্মশব্দের এক অর্থ বেদ; এই বেদের যে স্থানে প্রথম ও অধিক আবির্ভাব হইয়াছিল, সেই স্থানের নাম হইল ব্রহ্মাবর্ত্ত। ব্রহ্মাবর্ত্তেতেই ঋষিগণ ঋগ্বেদের মন্ত্র রচনা করিয়াছেন; প্রথম যুদ্ধবিগ্রহের কথা ঋগ্বেদেই দেখিতে পাই। যখন ভারতবর্ষে আর্য্যেরা আসিয়াছিল, তখন এখানে যে একে-

ধারে কোন প্রকার উন্নতি হয় নাই তাহা নহে; তখন এখানেও লৌহনির্ম্মিত বাটী প্রভৃতি দেখা গিয়াছিল।

আর্য্য ও পূর্ব্ববাসীদিগের মধ্যে প্রভেদ এই ছিল যে, আর্য্যেরা গৌরবর্ণ এবং এখানকার লোকেরা কৃষ্ণবর্ণ। বেদে পূর্ব্ববাসীদিগকে কৃষ্ণবর্ণ বলিয়া উল্লেখ আছে। আর্য্যেরা যখন এদেশে আসিয়া এদেশবাসীদিগকে তাহা-দিগের ভূমি হইতে তাড়াইয়া দিয়া বসতি করিতে লাগিল, তখন তাহারা নিম্নভূমি হইতে পর্ব্বত পাহাড়ে গিয়া বসতি করিল। সময়ে সময়ে তাহারা নিম্নভূমিতে আসিয়া আর্য্যদি-গের প্রতি দৌরাত্ম্য করিতে বিরত ছিল না; আর্য্যেরা হোম যাগ করিত, তাহারা তাহাতে বিঘ্ন উৎপাদন করিত। এই জন্য আর্য্যেরা পূর্ব্ববাসীদিগকে দস্যু নামে অভিহিত করিত। যুদ্ধেতে আর্য্যদিগের অত্যন্ত নিষ্ঠুরতার দৃষ্টান্ত দেখা যায়—আর্য্যেরা বিপক্ষদিগের ত্বক্

ছিঁড়িয়া ফেলিত, এরূপ বর্ণনাও বেদে দেখা যায়। ক্রমে ক্রমে আর্য্যেরা দস্যুদিগকে পরাস্ত করিয়া দাস করিয়া ফেলিল। তাহারাও ক্রমে অনুগত হইল, সেবা করিতে লাগিল—সেবা তাহাদিগের ধর্ম্ম হইল। পাছে দাসগণ উন্নত হয়, এই জন্য আর্য্যেরা তাহাদিগকে বেদে অধিকার দেয় নাই; ইহা আপনাদিগের নিজস্ব করিয়া রাখিয়াছিল। বেদে এমন কথা আছে যে, দাসদিগের মধ্যে যে বেদ পাঠ করে, তাহার জিহ্বা কাটিয়া দিবে; যে শ্রবণ করে, তাহার কর্ণ কাটিয়া দিবে। কিন্তু ক্রমে ক্রমে আর্য্য-দিগের সহিত দাসকন্যাদিগের বিবাহ প্রচলিত হইয়াছিল; আর্য্যগণ দাসকন্যাদিগকে বিবাহ করিতে পারিত কিন্তু দাসেরা আর্য্যকন্যাদি-গকে বিবাহ করিতে পারিত না। এইরূপ সঙ্কর বিবাহে আর্য্যদিগের দোষ হইত না এবং এই রূপ বিবাহ চলিত হওয়াতেই আর্য্য ও দাসদি-গের মধ্যে ঘোর বিবাদ অনেকটা শান্ত হইল।

ঈশ্বর তাঁহার মঙ্গল ইচ্ছা নিত্যই জানিতে-ছেন, তাহা জ্ঞানধর্ম্মের উন্নতি। এই উন্নতির নিদর্শন আর্য্যদিগের মধ্যে যাহা হইয়াছে, তাহাই বলিতেছি—তাহাদিগের মধ্যে উন্নতি হইয়াছে কত। প্রথম যখন তাহারা ফলাহার ও মৃগয়া করিয়া বেড়াইত, আর যখন আর্য্যাবর্ত্ত হইল, তুলনা করিয়া দেখ যে কত উন্নতি হইল। ঈশ্বরের সৃষ্টির লক্ষ্যই এই যে জ্ঞান-ধর্ম্মের উন্নতি।

অষ্টম উপদেশ—মনুষ্যের স্বাধীন ইচ্ছা।

(১৪ই বৈশাখ ব্রাহ্মসম্বৎ ৬২, ১৮১৩ শক।)

ঈশ্বরেরই এক ইচ্ছাতে প্রকৃতির সকল কার্য্য হইয়া যাইতেছে। অসীম আকাশে বিশ্বচরাচর তাঁহারই শাসনে চলিতেছে। তাঁহারই শাসনে সূর্য্যচন্দ্র গ্রহনক্ষত্র স্ব স্ব পথে ধাবিত হইতেছে। তাঁহার ইচ্ছাতে

পশুপক্ষী বৃক্ষলতাতে প্রাণ কর্ম্ম করিতেছে। তাঁহার ইচ্ছাতে প্রাণ বৃক্ষলতাকে শাখাপত্র দ্বারা শোভিত করিয়া পুষ্পফল উৎপাদন করিতেছে; তাঁহার ইচ্ছাতে পশুপক্ষীদিগের মধ্যে প্রাণ কার্য্য করিয়া ময়ূরাদিকে কত-প্রকার বিচিত্র বর্ণে সজ্জীভূত করিয়া দিতেছে। যে প্রাণ অশ্বকে নির্ম্মাণ করিতেছে, সেই প্রাণ হস্তীকে নির্ম্মাণ করিতেছে; সেই প্রাণই আবার ঈশ্বরের ইচ্ছাতে মনুষ্যের শরী-রকেও পোষণ করিতেছে।

বৃক্ষলতাতে মন নাই; পশু পক্ষীর যে মন, তাহা তাঁহারই শাসনে প্রবৃত্তি অনুসারে চলি-তেছে—যেমন প্রবৃত্তি উঠিতেছে, সেইরূপ চলিতেছে। কিন্তু ঈশ্বর মনুষ্যের শরীরে প্রাণ দিয়া, মন দিয়া; তাহার উপরে তাহাকে প্রবৃ-ত্তির অধীন করিয়া দিলেন না। মনুষ্য বিজ্ঞান-রাজ্যে উপস্থিত। সেই অনন্তজ্ঞান, মনুষ্যের শরীর বিজ্ঞানের ধর্ম্মের উপযোগী করিয়া

তাহাতে জ্ঞানের এক স্ফুলিঙ্গমাত্র প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিলেন ; সেই জ্ঞানই আত্মা। প্রকৃতি-রাজ্যের সকলই প্রবর্ত্তিত হইয়া, অন্যের দ্বারা নিযুক্ত হইয়া কার্য্য করে ; কিন্তু মনুষ্যে ঈশ্বর যে আত্মা দিলেন, আত্মা তাহার আপনার ইচ্ছাতে কার্য্য করিতেছে। মনুষ্য বিজ্ঞানাত্মা পুরুষ, সে আপনার ইচ্ছাতে সকলই করিতেছে। ঈশ্বর তাহাকে প্রকৃতি-রাজ্য হইতে নিষ্কৃতি দিয়াছেন।

আত্মা তাহার প্রথমাবস্থা অবধি স্বাধীনভাবে স্বীয় ইচ্ছানুসারে কার্য্য করিতেছে। বাহিরে যে বস্তু আছে, মানুষ শৈশবাবস্থাতে তাহা আপনি জানিতে চেষ্টা করে, ইহাতেই ইচ্ছার কার্য্য দেখা যাইতেছে। ইচ্ছা না থাকিলে মনুষ্যের কোনরূপ শিক্ষাই হইতে পারে না। বাহিরে যে বস্তু আছে, মনুষ্য তাহা প্রথম হইতেই হস্ত দ্বারা গ্রহণ করিয়া, আস্বাদন করিয়া শিক্ষা করিতে আরম্ভ করে ;

তাহার জ্ঞানেন্দ্রিয়ের কার্য্য সকল ক্রমে ক্রমে পরিস্ফুট হয়। এমন কি চলা, তাহাও মনুষ্যকে পরিশ্রম পূর্ব্বক ক্রমে ক্রমে শিক্ষা করিতে হইয়াছে। আবার কতদিন পর্য্যন্ত সে আপনি চেষ্টা করিয়া তবে ক্রমে ক্রমে সুস্পষ্ট রূপে কথা কহিতে পারে। মনুষ্যের কার্য্য প্রকৃতির বিপরীতে—প্রথম হইতেই তাহার ইচ্ছার উপর সব নির্ভর করিতেছে। তাহার দেখা, চলা, বলা, সকলই তাহার ইচ্ছার কার্য্য। সবই আপনাকে পরিশ্রম পূর্ব্বক শিখিতে হইবে; পিতামাতা প্রভৃতি তাহার শিক্ষার সাহায্য করেন মাত্র। গোরুর বৎস হইল, আপনিই দৌড়িতে লাগিল—তাহার কিছু শিখিবার আবশ্যক হইল না। কিন্তু ঈশ্বর মনুষ্যকে জ্ঞান দিয়া সকলের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ করিয়াছেন; মনুষ্যকেও যত্ন পূর্ব্বক ইচ্ছা করিয়া সমস্ত কার্য্য করিতে হইবে। প্রকৃতির অধীন যাহারা, তাহাদের নিজের যত্ন কিছুই

করিতে হয় না—তাহাদের ডাকা, চলা, সকলই স্বায়ত্ত। মনুষ্যের যেমন শৈশবাবস্থাতেও চলা প্রভৃতি শিক্ষা করিতে হয়, সেইরূপ যখন প্রথম বিদ্যাশিক্ষা করিতে হয়, তখন কত যত্ন আবশ্যক। আবার যৌবনকালে আপনার সাংসারিক প্রয়োজনীয় বস্তু সকল আপনার ইচ্ছাতে সংগ্রহ করিতে হইবে; তখন মানসম্ভ্রমরক্ষা, ধন উপার্জ্জন প্রভৃতি সমস্তই আপনার ইচ্ছাতে করিতে হইবে। ঈশ্বর মনুষ্যকেই কেবল আপনার সাধনার উপরে, আপনার ইচ্ছার উপরে, একেবারে ছাড়িয়া দিয়াছেন। এখানে আলস্যের স্থান নাই।

দেখ, মনুষ্যের আবার কত অভাব দিয়াছেন,—অভাব অল্প নয়। পশুদিগের একটা গহ্বর পাইলেই হইল; মনুষ্যের এক বাটী আবশ্যক, তাহা বিজ্ঞান সহকারে বুদ্ধি চালনা করিয়া যত্ন পূর্ব্বক নির্ম্মাণ করিতে হইবে। পশুদিগের চর্ম্ম লোমবিশিষ্ট, সেই লোমই

তাহাদিগের বস্ত্রের কার্য্য করিতেছে, আচ্ছাদক হইয়া শীত গ্রীষ্ম বর্ষাতে রক্ষা করিতেছে। মনুষ্যকে তাহার শরীরের জন্য পরিশ্রম পূর্ব্বক আচ্ছাদন প্রস্তুত করিতে হইবে। পশুরা আহারীয় দ্রব্য যেখানে সেখানে প্রাপ্ত হয়, মনুষ্যকে আহার প্রস্তুত করিতে হইবে। তাহাকে কৃষিকার্য্য করিতে হইবে; বর্ষা গ্রীষ্ম সহ্য করিয়া যত্নপূর্ব্বক শস্য উৎপাদন করিতে হইবে, তবে তাহার আহার পাওয়া যাইবে। পশুরা যাহা পায় তাহাই খায়, মনুষ্যকে আবার তাহার অন্ন রন্ধন করিতে হয়। ঈশ্বর পশুদিগের আত্মরক্ষার জন্য শৃঙ্গ প্রভৃতি অস্ত্র দিয়াছেন; আমাদের আত্মরক্ষার জন্য অস্ত্র প্রস্তুত করিয়া লইতে হইবে। এক সময় যখন আমাদিগকে পশুদিগের সঙ্গে একত্র বাস করিতে হইয়াছিল, তখন অস্ত্রশস্ত্রের দ্বারাই বিপদ নিবারণ করিতে হইয়াছিল। মনুষ্যের সব-ই এই রকম আপন ইচ্ছাতেই করিয়া লইতে হয়।

ঈশ্বরের করুণা এই যে, মনুষ্যকে তাহার ইচ্ছার সঙ্গে সুখও দিয়াছেন। শিশু যখন বাহিরের বস্তু জানিতে পারিল, তাহাতে তাহার কত আনন্দ হইল। আপনি ইচ্ছাপূর্ব্বক যখন চলিতে শেখে, তখন আনন্দের সহিত দৌড়িতে থাকে, লাফালাফি করে; তখন তাহার কত স্ফূর্ত্তি। নিজে ইচ্ছাপূর্ব্বক বিদ্যাশিক্ষা করিতে পারিলে হৃদয়ে কত আনন্দ হয়; সেইরূপ অন্যের কাছে গান বাজনা শুনিয়াও আনন্দ হয় বটে, কিন্তু যখন আমি নিজে পারিব, তখন আরও কত না আনন্দ হইবে। পৈতৃক ধন পাইয়া যে সুখ, তাহা অপেক্ষা স্বোপার্জ্জিত ধনে কত আনন্দ—সে সুখ পৈতৃকধনের অধিকারী পায় না। ইচ্ছাপূর্ব্বক কার্য্য সিদ্ধ করিতে পারিলে পরিণামে সুখ হয়, ইহাই ঈশ্বরের করুণা।

ইচ্ছা, বিদ্যাশিক্ষা বিষয়কর্ম্ম প্রভৃতি সম্বন্ধে বলিলাম; ধর্ম্মসাধনও ইচ্ছার কার্য্য। যখন

কোন প্রবৃত্তির প্রতিকূলে আপনি ইচ্ছা পূর্ব্বক ধর্ম্মসাধন করিতে পার, তখন কেমন আনন্দ হয়। সহস্র উত্তেজনার মধ্যে, সহস্র প্রকার প্রলোভন তাচ্ছিল্য করিয়া যদি ধর্ম্মরক্ষা করিতে পার, তাহা হইলে তোমার কেমন আনন্দ হয়। আমাদের ইচ্ছা এখনও দুর্ব্বল, তবুও সেই ইচ্ছা অভ্যাসের দ্বারা কত কঠোরতাকে অতিক্রম করিতে পারে। ইচ্ছা, কখনও প্রবৃত্তির বিপক্ষে যাইতে পারে, কখনও বা প্রবৃত্তির দাস হইয়া পড়ে। পূর্ণমাত্রায় আমরা ইচ্ছানুসারে কাজ করিতে পারি না। এই আমাদের প্রথম মনুষ্য-জন্ম—ইহা শিক্ষার জন্য। এখানে জ্ঞানধর্ম্মের উন্নতি শিক্ষা করিতে হইবে। অভ্যাসের দ্বারা ইচ্ছাকে আয়ত্ত করিতে হইবে। যখন ইচ্ছা দ্বারা প্রবৃত্তি সকলকে আপনার বশীভূত করিতে পারিবে, তখন কেমন আনন্দ হইবে।

ইচ্ছাপূর্ব্বক ধর্ম্মের জন্য যখন প্রাণ পর্য্যন্ত

দেয়, সেই সমস্ত কষ্ট বিপদের মধ্যেও যে কি আনন্দ, তাহা যে ধর্ম্মের জন্য প্রাণ দিয়াছে, সে-ই জানে। নানক প্রথমে চাষাদিগের মধ্যে ধর্ম্মপ্রচার করেন। তাহার পরে ক্রমে ক্রমে দশম গুরু গুরুগোবিন্দের সময় সেই ধর্ম্মের বলেই তাহারা বলবান্ হইয়া উঠিল; এবং দিল্লীর বাদ্‌শাহের অধীন থাকিলেও তাঁহার রাজ্যের নিয়ম, তাঁহার আদেশ, সকলই অমান্য করিতে লাগিল। তাহাদিগের শাসনের জন্য দিল্লীর সম্রাট ফৌজ পাঠাইতে লাগিলেন, শিখেরাও তাহাদিগকে পরাস্ত করিতে লাগিল। এই শিখদিগের মধ্যে অকালী নামে এক সম্প্রদায় হইল; তাহারা ঈশ্বরের অকাল মূর্ত্তি পূজা করে—তাহারা বড় উন্নত সম্প্রদায়। তাহাদিগের ব্রত যুদ্ধেতে প্রাণ দেওয়া। লোকেরা দলে দলে আসিয়া এই অকালী সম্প্রদায়-ভুক্ত হইতে লাগিল। মুসলমানেরা ইহাদিগের সঙ্গে কি করিবে? দিল্লীর সম্রাটের

সঙ্গে কৃষকেরা যুদ্ধ করিয়াছে—কি আশ্চর্য্য ধর্ম্মের বল ! এই ধর্ম্মের বল পূর্ব্বকার শিখদিগের কাছেই শিক্ষা কর। এই যুদ্ধে কখনও বা মুসলমানেরা জিতিয়াছে, কখনও বা শিখেরা জিতিয়াছে। একবার শিখেরা পরাজিত হইয়া এক শতজন বন্দী হইয়াছিল ; সম্রাটের সেনাপতি সেই একশত জনকে সারি সারি দাঁড় করাইয়া এক হস্তে তরবারি অপর হস্তে কোরাণ আনিয়া প্রথম ব্যক্তিকে বলিল "বল্ লা এলাহা এল্লাল্লা মহম্মদ রসুল আল্লা"। শিখ বলিয়া উঠিল—"একমেবাদ্বিতীয়ং, গুরু নানককী জয়" আর তৎক্ষণাৎ তাহার মস্তক শরীর হইতে তরবারি আঘাতে বিচ্ছিন্ন হইল। আবার সে দ্বিতীয় ব্যক্তিকে বলিল, "বল্ লা এলাহা এল্লাল্লা মহম্মদ রসুল আল্লা" দ্বিতীয় ব্যক্তিও বলিয়া উঠিল—"একমেবাদ্বিতীয়ং, গুরু নানককী জয়"। আর তৎক্ষণাৎ তাহারও মস্তক বিচ্ছিন্ন হইল। এই প্রকারে এক শত শিখ

ধর্ম্মের জন্য অনায়াসে প্রাণ দিল। এই ভয়ের মধ্যে, এই কষ্টের মধ্যে, তাহারা কেমন আনন্দের সহিত প্রাণ দিয়াছে। ধর্ম্মের জন্য যাহারা প্রাণ দেয়, পরমাত্মা তাহাদিগকে সেই অনুসারে পরমানন্দ বিধান করেন। আজ এই পর্য্যন্ত বলিলাম; মনুষ্য বুদ্ধিমূলক ধর্ম্মমূলক বিজ্ঞানাত্মা পুরুষ, তাহার কার্য্য দেখাইলাম; আজ মনুষ্যের ইচ্ছার স্বাধীনতার বিষয় বলিলাম।

নবম উপদেশ—আর্য্যদিগের উন্নতি।

(২১ বৈশাখ, ৬২ ব্রাহ্মসম্বৎ, ১৮১৩ শক।)

পূর্ব্বে দলে দলে ঋষিরা আসিয়া ভারতবর্ষ অধিকার করিলেন। পূর্ব্ববসতি অপেক্ষা ভারতবর্ষ তাঁহাদিগের অত্যন্ত মনোনীত হইল। এখানে অরণ্য সকল পরিষ্কার করিয়া, হিংস্র জন্তু সকল বিনাশ করিয়া, পূর্ব্বে যাহারা বাস

করিত, তাহাদিগকে পরাজয় করিয়া আর্য্যেরা এই ভারতরাজ্যে মহারাজ্য সংস্থাপন করিলেন। ইহাতে ঈশ্বরের মঙ্গল ইচ্ছা কেমন প্রকাশ পাইতেছে। জ্ঞানধর্ম্মের উন্নতি কত হইল। আর্য্যেরা পশুপালক ছিলেন; সে অবস্থা হইতে আর্য্যদিগের জ্ঞানধর্ম্মের কত উন্নতি এই ভারতবর্ষে প্রকাশ পাইল। তাঁহারা সমৃদ্ধিমান হইলেন, বিক্রমে তেজস্বী হইলেন—সকলই তাঁহাদিগের আপনাদিগেরই সাধনার ফলে, আপনাদিগেরই যত্নে। সেই যে ঈশ্বর মনুষ্যকে স্বাধীনতা দিয়াছেন, সেই স্বাধীনতার বলে, আপনার যত্নে কত উন্নতি হইতে পারে, তাহার নিদর্শন এই আর্য্যদের মধ্যে দেখ।

আর্য্যেরা চারি বর্ণে বিভক্ত হইয়া রাজ্যের উন্নতি সাধন করিতে লাগিলেন। সেই চারি বর্ণ, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। ব্রাহ্মণ হইল ব্যবস্থাপক; রাজার রাজকর্ম্মের উপযুক্ত

ব্যবস্থা প্রদান করিতে লাগিল। ক্ষত্রিয় হইল সৈন্য সামন্ত; তাহাদের সেনাপতি হইলেন রাজা। সেই রাজা ব্যবস্থানুযায়ী প্রজাদিগকে শাসন ও পালন করিতে লাগিলেন এবং বাহি-রের শত্রু হইতে দেশকে রক্ষা করিতে লাগি-লেন। বৈশ্য, বাণিজ্য কৃষিকর্ম্ম প্রভৃতি রাজ্যের সাংসারিক কর্ম্ম সমূহের ভার পাইল। শূদ্রদিগের হইল সেবাধর্ম্ম। কিন্তু কালক্রমে উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে অনেক প্রকার কর্ম্ম বাড়িল —প্রয়োজন অধিক হইয়া পড়িল। স্বর্ণকার, কর্ম্মকার প্রভৃতির আবশ্যক হইয়া পড়িল; তখন বৈশ্যের মধ্যে কর্ম্মের জন্য নানা জাতি-ভেদ হইল। তখন বর্ণসঙ্করও আবশ্যক হইয়া-ছিল; সুতরাং বৈশ্যদিগের পরস্পরের মধ্যে বিবাহ বদ্ধ থাকিল না। বৈশ্যদিগের মধ্যেই শূদ্রকন্যাদিগের বিবাহ হইয়া অনেক বর্ণসঙ্কর উৎপন্ন হইল; ক্ষত্রিয়দিগের মধ্যেও কতক বর্ণসঙ্কর হইয়াছিল। কিন্তু ব্রাহ্মণদিগের

মধ্যে আর বর্ণসঙ্কর হইল না; কারণ ব্রাহ্মণের ঔরসে শূদ্রার গর্ভের সন্তান ব্রাহ্মণ বলিয়াই গ্রাহ্য হইল। প্রতিলোম বিবাহ করিলে, অর্থাৎ শূদ্র, বৈশ্য বা ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণীকে বিবাহ করিলে তাহাদের সন্তান চণ্ডাল নামে উক্ত হইত এবং তাহাদিগের সঙ্গে ভদ্রলোকে আলাপ ব্যবহার সকলই পরিত্যাগ করিত। বিবাহ বিষয়ে আর্য্যদিগের এই প্রকার শাসন ছিল।

আর্য্যদিগের মধ্যে প্রজাপীড়ন করিয়া যথেচ্ছ কর-গ্রহণের রীতি প্রচলিত ছিল না। রাজা প্রজাদিগের উৎপাদিত শস্যপ্রভৃতির ছয় অংশের মধ্যে কেবল মাত্র এক অংশ গ্রহণের অধিকারী ছিলেন; সেদিন পর্য্যন্ত কাশ্মীরে সেই প্রথা প্রচলিত ছিল। যাহারা পূর্ব্বে পশুপালক ছিল, মৃগয়া করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিত, তাহারা এখন ক্রমে ক্রমে স্বাধীন চেষ্টায় কত বিক্রমশালী হইল; তাহা-

দিগের মধ্যে জ্ঞানধর্ম্মের কেমন বিকাশ ও উন্নতি হইল।

আর্য্যেরা বিষয়কর্ম্ম, রাজধর্ম্ম, বাণিজ্য প্রভৃতি বিষয়ে বিস্তর উন্নতি করিয়াছিলেন। ইহা ব্যতীত কেবল বিজ্ঞান, তাহাতেও ইঁহারা কত উন্নতি করিলেন। এই জ্যোতিষ শাস্ত্র—ইহার জন্য আর্য্যেরা জগদ্বিখ্যাত। ১,২ প্রভৃতি ১০ পর্য্যন্ত সংখ্যাগণনা করা কত-দূর বুদ্ধির কার্য্য। ইহা ভারতবর্ষ হইতেই প্রথম প্রচার হয়। জ্যোতিষ শাস্ত্রের রাশি গণনা দেখ, ঐ মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কট প্রভৃতি রাশি ভারতবর্ষ হইতেই ভিন্ন ভিন্ন দেশে প্রচার হইয়াছে। এই স্থান হইতেই জ্যোতি-র্ব্বিদ্যার বিকাশ। আবার চিকিৎসা বিদ্যা—ইহাতেও তাঁহারা কত উন্নতি করিয়াছেন। তাঁহারা অস্ত্রচিকিৎসা, শারীরবিধান সকলই জানিতেন। এখানকার কবিতা রচনা—এ বিষয়ে সেই পশুপালেরা কত উন্নতি করি-

লেন। আর্য্যদিগের বর্ণাবলী বিবেচনা করিয়া দেখ, কেমন শ্রেণীবদ্ধ করিয়াছেন। স্বরবর্ণ পৃথক্ করিলেন; জিহ্বা হইতে যে শব্দ বাহির হইল, তাহাকে পৃথক করিয়া হল বর্ণ নাম দিলেন। আবার এই স্বর ও হল উভয়েরই মধ্যে কণ্ঠ্য আছে, তালব্য আছে, দন্ত্য আছে, ওষ্ঠ্য আছে। সংস্কৃত ভাষার যেমন মহত্ত্ব, তেমনি সৌন্দর্য্য। কিন্তু এই সব আপনাদেরই চেষ্টায় হইয়াছে, আপনাদের যত্নেই হইয়াছে, কাহাদেরও আশ্রয়ে হয় নাই। আর্য্যদের মধ্যে কি প্রকার উন্নতি হইয়াছে, তাহা পর্য্যালোচনা করিয়া দেখা গেল। আর একটী আর্য্যদের উন্নতির কথা বলিতেছি—তাহা সঙ্গীত বিদ্যা। সাতটা স্বর তীব্র কোমলে বিভাগ করিয়া সঙ্গীতের কি মাধুর্য্যই আনয়ন করিয়াছেন। এই সমুদায়ই হইয়াছে স্বাধীনতার বলে।

ঈশ্বরের নিত্য মঙ্গল ইচ্ছা এই যে তাঁহার

সৃষ্টিতে জ্ঞানধর্ম্মের উন্নতি হউক। স্বাধীনতার বলেই এই জ্ঞান-ধর্ম্মের উন্নতি। যখন সেই জ্ঞানধর্ম্মকে রক্ষা করিতে না পারা যায়, তখন আবার অধোগতি হয়। জীবনের স্রোতে হয় উন্নতি কিম্বা দুর্গতি হইবেই; এই উভয়ের মধ্যে মধ্যপথ নাই। এই দুয়ের অভাবে জীবন শূন্য হয়। প্রকৃতি বাধিত হইয়া সকল কার্য্য করে, মানুষের সব আপনার ইচ্ছাতে করিয়া লইতে হয়। যদি সেই স্বাধীনতা পাইয়াও প্রকৃতির বিরোধে না যাইতে পারি, তবে সেই স্বাধীনতার বল গেল; তখন আবার সমুদয় অধোগতির দিকে যাইতে থাকে। তাহার দৃষ্টান্ত ভারতবর্ষে দেখা যায়। এখানে উন্নতি কত দূর হইয়াছিল; আবার যখন সেই উন্নতি স্থগিত হইল, তখন সব গেল। কোথা হইতে দুর্য্যোধন আসিয়া এক সামান্য ভূমির জন্য ভ্রাতাদের সহিত কলহবিবাদ লাগাইয়া দিল। সে সময়ে

এতদূর অধোগতি হইয়াছে যে এক পাশা খেলিয়া ছুর্য্যোধন যুধিষ্ঠিরকে রাজ্য হইতে বঞ্চনা করিল—ইহাতে আর ধর্ম্মরক্ষা হইতে পারিল না। ধর্ম্মহানির পরাকাষ্ঠার দৃষ্টান্ত এই যে, রাজমহিষী দ্রৌপদীকে সভামধ্যে আনয়ন করিয়া অপমানিত করা হইল। ক্ষত্রিয়েরা, কোথায় শত্রু হইতে দেশকে রক্ষা করিবে; তাহার পরিবর্ত্তে সকলে একত্র হইয়া পরস্পরকে বিনাশ করিল। যাহারা দেশকে রক্ষা করিতে সমর্থ, তাহারাই বিনাশ পাইল। আবার ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় যুদ্ধ করিয়া পরস্পর বিনাশ পাইল। ইহাতে সমাজের যে একতার বল, তাহাও হ্রাস হইল। এইরূপ বিবাদ কলহ অধোগতির এক প্রধান মূল। যদি এ সকল না হইত, তাহা হইলে আজ ভারতবর্ষকে কেহই লইতে পারিত না; জ্ঞানধর্ম্মের স্রোত বন্ধ হইত না, আরও উন্নতি হইত। জ্ঞানধর্ম্মের উন্নতির সঙ্গেই সুখ

সৌভাগ্যেরও উন্নতি; তাহার অধোগতির সঙ্গে দুঃখ ক্লেশ যন্ত্রণা। ভারতবর্ষের লোকেরা আপনাদের দোষেই আপনারা শাস্তিভোগ করিল। তাহাদের স্বাধীনতা নিজ হস্ত হইতে চলিয়া গেল; মুসলমানেরা আসিয়া আর্য্যভূমি অধিকার করিল। সেই পর্য্যন্ত আর্য্যদিগের কি দুঃখ, কি দুর্দ্দশা! আজিও সেই দুঃখস্রোতের অবসান হয় নাই। এখন আর সে অনুতাপ করিলে কি হইবে "রঘুপতেঃ ক্ব গতোত্তরকোশলা, যদুপতেঃ ক্ব গতা মথুরাপুরী।"

ভারতের আর্য্যদিগের কথা বলিলাম; প্রতিবাসী পারসীক আর্য্যগণও বলবিক্রমে কত পরাক্রমশালী হইয়াছিল। গ্রীকেরাও সেই একই আর্য্যবংশ হইতে উৎপন্ন—তাহারাও কত পরাক্রমশালী ছিল। তাহাদিগের মধ্যে কত দার্শনিক উঠিয়াছিল; কত প্রকার জ্ঞানের চর্চ্চা ছিল; প্রস্তরমূর্ত্তির মধ্যে কি

চমৎকার সৌন্দর্য্যই বিকাশ করিত। এই গ্রীক ও পারসীকদিগের মধ্যে যখন যুদ্ধ হইয়াছিল, তখন উহাদিগের মধ্যে যাহারা জ্ঞানধর্ম্মে অধিকতর উন্নত হইয়াছিল, তাহারাই জয়লাভ করিয়াছিল।

সকলের অপেক্ষা রোমকদিগের দৃষ্টান্তে দেখ। তাহারা স্বাধীনভাবে ক্রমে ক্রমে পৃথিবীতে কেমন অত্যুন্নত সাম্রাজ্য স্থাপন করিল! এ প্রকার কেন হইল?—ঐ জ্ঞানধর্ম্মের উন্নতি সঙ্গে সঙ্গে হইয়াছে বলিয়া; এরূপ উন্নত হইতে গিয়া তাহাদিগকে কত স্বার্থত্যাগ করিতে হইয়াছে। ক্রমে রোমের প্রজাতন্ত্র শাসনপ্রণালী চলিয়া গেল; রোম সম্রাটের অধীন হইল। তখন ক্রমে ক্রমে এতদূর অবনতি হইল যে, শেষে সম্রাটকে ঈশ্বর বলিয়া মানিত; সম্রাট ঈশ্বর, ইহা অস্বীকার করিলে শাস্তি পাইতে হইত। যখন জ্ঞানধর্ম্ম ছিল, তখন কত উন্নতি করিল, আবার যখন জ্ঞান-

ধর্ম্মকে পরিত্যাগ করিল, তখন সমস্তই গেল—এখন রোমের আর সে প্রতাপ কোথায়? এই রকম ঈশ্বরের মঙ্গল ইচ্ছার বিপরীতে চলিলেই "দুর্ভিক্ষাৎ যান্তি দুর্ভিক্ষং ক্লেশাৎ ক্লেশং ভয়াদ্ভয়ং" দুর্ভিক্ষ হইতে দুর্ভিক্ষে, ক্লেশ হইতে ক্লেশে, ভয় হইতে ভয়ান্তরে পতিত হয়।

রোম রাজ্যের বিনাশ হইল বলিয়া কি ঈশ্বরের মঙ্গল সংকল্প বিনাশ পাইবে? তাহা হইতে পারে না, রোমকেরাই বিনাশ পাইল মাত্র। তাহাদিগের অপেক্ষা যাহারা নীচ বর্ব্বর জাতি ছিল, তাহারা, রোমের যাহা কিছু ভাল অবশিষ্ট ছিল, তাহাই গ্রহণ করিয়া নিজের যত্নে আবার দেখ ইউরোপীয় জাতি হইয়া পড়িল। রোমকদিগের অপেক্ষা তাহারা জ্ঞানধর্ম্মে অনেক উন্নত হইয়া পড়িয়াছে। আবার ইহাদিগের মধ্যে যাহারা জ্ঞানধর্ম্মে উন্নতি করিবে, তাহারাই

শ্রেষ্ঠ হইবে। কেবল জ্ঞানধর্ম্মের বলেই ইউরোপীয়গণ খুব উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছে। এখন ইহাদিগের মধ্যে উন্নতি চলিতেছে, কিন্তু যাহারা চেষ্টা ও যত্ন করিবে, তাহাদের আরও উন্নতি হইবে। এখন ইহাদিগের মধ্যেও দোষের সূত্র রহিয়াছে, অনেক ছিদ্র রহিয়াছে, যাহাতে অধোগতি হইলেও হইতে পারে। ইহাদিগের মধ্যে পরস্পারের জাতীয় আক্রোশ রহিয়াছে—বিবাদ কলহের সূত্র রহিয়াছে ; পরের স্বাধীনতালোপ করা, এই একটা প্রবল অন্তরের রিপু আছে। এই সূত্রে যুদ্ধ বিগ্রহ হইতে পারে এবং বিরোধী পক্ষদ্বয়ের মধ্যে যাহারা প্রজাদিগের মঙ্গল কামনা না করিয়া স্বার্থপর হইয়া, অধর্ম্মকে আশ্রয় করিয়া অন্যের অধিকারে লোভবশতঃ অন্যায় পূর্ব্বক যুদ্ধ করিতে যাইবে তাহাদিগেরই অধোগতি হইবে। ঈশ্বরের নিত্য মঙ্গল ইচ্ছা এই যে জ্ঞানধর্ম্মের উন্নতি হউক—

এই অনুসারেই সকল কার্য্য হইবে। তাঁহার প্রসাদে সেই ইচ্ছা অবগত হইয়াই এইরূপ বলিতেছি।

দশম উপদেশ—ধর্ম্মের বিকাশ।

(২৮শে বৈশাখ, রবিবার, ৬২ ব্রাহ্ম সম্বৎ ১৮১৩ শক।)

আর্য্যেরা প্রথম যখন এখানে কৃষিবাণিজ্য করিয়া সভ্যতা লাভ করিতে লাগিলেন; যখন থাকিবার জন্য ভাল আসন, বসন, ভূষণ প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া আপনাদের সভ্যতার ভাব প্রকাশ করিতে লাগিলেন; তখন হইতে ক্রমে ক্রমে তাঁহাদের মধ্যে বিজ্ঞানের চর্চ্চা হইতে লাগিল। আপনাদের যে সকল প্রয়োজন, সেই সকল পূরণ করিতে করিতে বিজ্ঞান উন্নত হইতে লাগিল। যখন গৃহনির্ম্মাণ হইতে লাগিল, ভাল নৌকা প্রস্তুত হইতে লাগিল, সেই সঙ্গে বিজ্ঞানেরও উন্নতি হইতে

লাগিল। তাঁহারা আপনাদের অভাব পূরণ করিতে লাগিলেন, আর বিজ্ঞানের উন্নতি হইতে লাগিল। আবার সেই বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আপনার আপনার প্রয়োজন, আপনার আপনার স্বার্থভাব অধিক হইয়া উঠিল। স্বার্থভাব চরিতার্থ করিবার জন্য যত প্রকার কুপ্রবৃত্তি উঠিতে পারে, তাহাও উঠিতে লাগিল। অপরকে ক্লেশ দিয়া, প্রতারণা করিয়া বিষয় অর্জ্জন করিবার জন্য কত লোকের চেষ্টা হইল। কেবল এইরূপে আপনার আপনার স্বার্থের জন্য পরস্পরের মধ্যে দ্বন্দ্ব বিবাদ কলহ উঠিতে লাগিল।

কিন্তু নিরঙ্কুশ স্বার্থভাব মনুষ্যের হৃদয়ে রাজত্ব করিতে পারিল না। ঈশ্বর যে ধর্ম্ম-বিজ্ঞান দিয়াছেন তাহাও উদ্দীপিত হইল; তাহারা সেই ধর্ম্মের মৃদুস্বর শুনিতে পাইল যে পরদ্রব্য অপহরণ করা উচিত নহে, প্রতারণা করা উচিত নহে, অন্যের প্রতি অন্যায়

আচরণ করা উচিত নহে। ধর্ম্মবিজ্ঞান যদি না থাকিত, আপনার প্রয়োজন সাধনের নিমিত্ত যদি বিষয়-বিজ্ঞানই থাকিত তাহা হইলে মনুষ্যের বড়ই দুর্গতি হইত। ঈশ্বর তাই ধর্ম্মবিজ্ঞান দিলেন; এই ধর্ম্মবিজ্ঞানও ক্রমে পরিস্ফুট হইতে লাগিল। ঈশ্বর মানুষের মনে ধর্ম্মবিজ্ঞান দিয়া রাখিয়াছেন কি-না, তাই তাহা ক্রমে ফুটিতে লাগিল। ঈশ্বরের মঙ্গল ইচ্ছা—জ্ঞান এবং ধর্ম্মের উন্নতি—সম্পন্ন হইতে লাগিল। যদি সভ্যতার সঙ্গে ভদ্রতা ও ধর্ম্মভাব না উঠিত, তবে সে সভ্যতায় কি হইত? যেখানে জ্ঞান, সেখানে যদি ধর্ম্ম না থাকে, তবে বড়ই বিশৃঙ্খলা। পূর্ব্ব হইতেই আর্য্যদিগের মধ্যে জ্ঞান ও ধর্ম্ম উভয়ই বিদ্যমান ছিল।

মহাভারতের সভাপর্ব্বের মধ্যে যেরূপ সভার বর্ণনা আছে, তাহাতে বুঝা যায় যে, সেই সময়ে বিজ্ঞানের কত উন্নতি হইয়াছিল।

দিল্লীর কাছে যে কুতবমিনার নামে এক স্তম্ভ আছে, তাহাও সেই সময়েরই। পুরাতন স্তম্ভের উপর আরও কতকটা গাঁথা আছে; কিন্তু সেটুকু নিতান্ত আধুনিক বলিয়া স্পষ্ট বুঝা যায় এবং পুরাতন ভাগের সঙ্গে তাহার তুলনাই হইতে পারে না। এই কুতবমিনারের সংলগ্ন মহাভারতবর্ণিত সভাগৃহের ভিত্তিস্তম্ভ সকলের চিহ্ন অনেক আয়তন-ভূমি লইয়া এখনো রহিয়াছে দেখা যায়। এইটুকু বাড়াইয়া মুসলমান নবাব আপনার নামানুসারে কুতবমিনার নাম দিয়া আপনার মিথ্যা যশ ঘোষণা করিল। কাশ্মীরের এক উচ্চ পর্ব্বতের শৃঙ্গের উপর এমন এক দেবালয় ছিল; যাহার বহিঃস্থ প্রকোষ্ঠ সকলের মধ্যে সহস্র সহস্র অতিথির উত্তম সমাবেশ হইতে পারিত, মুসলমানদিগের অত্যাচারে সেই দেবালয়ের দেবপ্রতিমা সকল বিকৃত হইয়া পড়িয়াছে। কাশীতে পূর্ব্বে যেখানে বিশ্বেশ্বরের মন্দির

ছিল,এখন সেইখানে মুসলমান সম্রাটের প্রতিষ্ঠিত এক মস্‌জীদ আছে। মুসলমান-রাজত্ব-কালে হিন্দুদিগের উপর মুসলমানদিগের বিশেষতঃ আওরঙ্গজেবের বড়ই আক্রোশ ছিল। বৃন্দাবনে গোবিন্দজীর মন্দির ছিল, তাহা আটতলা; মুসলমানেরা তাহা ভাঙ্গিয়া নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে—এখনকার মন্দির একতলা। ঈশ্বরের মঙ্গল ইচ্ছা যে জ্ঞান-ধর্ম্মের উন্নতি হউক, তাহা কখনই ব্যর্থ হয় না। মুসলমানদিগের দৌরাত্ম্য যখন বড় বেশী হইল, তাহারা ক্রমে বলহীন হইয়া পড়িল। ইংরাজেরা তাহাদের অপেক্ষা অনেক উন্নত, তাহারাই ভারতবর্ষ অধিকার করিতে সক্ষম হইল। সেই সময়ে এখানে ডচ্, ফরাসি, দিনেমার প্রভৃতি নানা জাতি ব্যবসাবাণিজ্য করিতে আসিয়াছিল। তাহারা, কেহ বা চন্দননগরে, কেহ বা শ্রীরামপুরে, কেহ বা চুঁচুড়ায়, এইরূপে গঙ্গানদীর উপকূলে

ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ব্যবসাবাণিজ্যের কারখানা খু-লিয়া বঙ্গদেশকে ঘিরিয়া বসিল। ক্রমে তাহা-দিগের সকলেরই মনেতে ভারতবর্ষ অধিকার করিবার বাসনা উপস্থিত হইল। কিন্তু তাহা-দিগের মধ্যে ইংরাজদিগেরই কৌশল, বিজ্ঞান, ধর্ম্মবল অধিক ছিল, তাই তাহারাই অন্যান্য সকলকে পরাস্ত করিয়া ভারতবর্ষ মুসলমান-হস্ত হইতে অধিকার করিতে পারিল। পূর্ব্বে ভারতবর্ষে নানা রাজা ছিলেন; তাঁহারা প্রত্যে-কেই আপনাকে বলিতেন চক্রবর্ত্তী, সমস্ত ভারতবর্ষের অধিপতি; অথচ তাঁহারা কোন কোন বৃহৎ বা ক্ষুদ্র প্রদেশের রাজা ছিলেন মাত্র। রামায়ণ মহাভারত দেখিলে দেখা যায় যে কত শত রাজগণ স্বাধীন ভাবে ভারত-বর্ষের বিভিন্ন স্থানে রাজত্ব করিতেন। মুসল-মানদিগের রাজত্বকালেও বলিতে গেলে, চক্র-বর্ত্তী, ভারতবর্ষের একছত্রী সম্রাট কেহই ছিলেন না; দিল্লীর বাদশাহ নামেমাত্র সমস্ত

ভারতবর্ষের অধিপতি ছিলেন। বিভিন্ন প্রদেশের শাসনকর্ত্তাগণ নামে দিল্লীর সম্রাটের অধীন হইলেও আপনাদিগের অধীনস্থ প্রদেশ সমূহে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে রাজক্ষমতা পরি-চালনা করিতেন। কিন্তু ইংরাজদিগকে দেখ, ভারতবর্ষের যথার্থ একাধিপতি হইয়া সকলকে এক নিয়মে শাসন ও পালন করিতেছে। যতদিন ইহারা প্রজার মঙ্গল-ইচ্ছু থাকিবে, প্রজার ধনলোভে রাজ-কার্য্যের বিশৃঙ্খলা উপ-স্থিত না করিবে, ততদিন তাহারাই এই রকম রাজা থাকিবে। যখন তাহারা অত্যন্ত গর্ব্বিত হইয়া উঠিবে, তখন গর্ব্ব খর্ব্ব হইবে। তখন আবার ইহাদিগের অপেক্ষা যাহারা জ্ঞানধর্ম্মে উন্নত হইবে, তাহারাই ভারতবর্ষের পরিত্রাতা হইবে; কিম্বা যদি ভারতবর্ষীয়েরা জ্ঞানধর্ম্মে উন্নত হয়, তাহা হইলে তাহারা আপনারাই আপনাদিগকে উদ্ধার করিবে। সকলই ইচ্ছার স্বাধীনতার উপরে, জ্ঞান-ধর্ম্মের উন্নতির উপরে

নির্ভর করিতেছে। ঈশ্বরের কেমন মহিমা যখনই অধর্ম্ম উপস্থিত হয়; তখনই রুদ্রদেব জাগ্রত হইয়া উঠেন এবং অধর্ম্মকে সমূলে বিনাশ করিয়া আবার নূতন প্রকার সমাজ স্থাপন করেন।

একাদশ উপদেশ—ঈশ্বর-স্পৃহা।

১১ই জ্যৈষ্ঠ, ৬২ ব্রাহ্ম সম্বৎ ১৮১৩ শক।

ঈশ্বরের মঙ্গল ইচ্ছা এই যে জ্ঞানধর্ম্মের উন্নতি হউক। শরীর ও প্রাণ পোষণের নিমিত্ত যে সকল অভাব আমাদের আছে, সেই সকল অভাব-পূরণের জন্য বিজ্ঞান ও ধর্ম্মের যে উন্নতি হইয়াছে তাহাই আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি। প্রকৃতিরাজ্যে যে পশুপক্ষী আছে, তাহাদের ক্ষুধা মোচনের অভাব আছে, তাহাদেরও তাহা পূরণ করিয়া লইতে হয়। কিন্তু তাহারা ইচ্ছার বলে না করিয়া মনের

প্রবৃত্তি অনুসারে অন্নপান আহরণ করে। মনুষ্য মনের বলে নহে, আপনার ইচ্ছার বলে স্বাধীনভাবে সমুদয় অভাব মোচন করিবে ইহাই মনুষ্যের বিশেষ অধিকার; তাহাতে যে মনুষ্য-সমাজে বিজ্ঞান ও ধর্ম্মের উন্নতি হইয়াছে, তাহা বলিয়াছি। তাহাও বড় অল্প হয় নাই; শরীর ও প্রাণকে পোষণ করিবার জন্য যে সকল অভাব আসিয়াছিল, সেই সকল অভাব মোচন করিতে করিতে বিজ্ঞানের ও ধর্ম্মভাবের কত না প্রাদুর্ভাব হইয়া উঠিল—তাহাতেই আর্য্যদের এত উন্নতি! কেবল সেই এক অভাব মোচন করিতে করিতে জ্ঞানে, ধর্ম্মে, সভ্যতাতে, ভদ্রতাতে আর্য্যদিগের কত উন্নতি হইয়াছে। যখন এত বিজ্ঞান আরম্ভ হইল, যখন ধর্ম্মের আবশ্যক হইল, তখনই সমাজব্যবস্থার আবশ্যক হইল; তখন ব্রাহ্মণেরা ধর্ম্মের অনুকূল ব্যবস্থা করিল। কেবল যে আপনি আপনার

ধর্ম্মের উপর নির্ভর করিবে, তাহা নহে, সমাজ-ব্যবস্থার সঙ্গে রাজব্যবস্থাও আসিয়া পড়িল। যদি আপনারাও স্বাধীনভাবে ধর্ম্মরক্ষা করিতে না পারিত, তথাপি রাজভয়ে ধর্ম্মরক্ষা করিতেই হইত। যখন সভ্যতা অনেক বিস্তৃত হইয়া পড়ে, তখন প্রতিজনের ইচ্ছার উপর নির্ভর করা যায় না—কখনও তাহা কুপ্রবৃত্তি দ্বারা চালিত হয়, কখনও বা সুপ্রবৃত্তি দ্বারা চালিত হয়। ঈশ্বরের মঙ্গল ইচ্ছা এই যে জ্ঞানধর্ম্মের উন্নতি হউক, তাহার উপায় এই করিয়া দিলেন যে, যে ব্যক্তি আপনি ধর্ম্মপথে না থাকিবে, তাহাকে ভয়ে থাকিতে হইবে; ধর্ম্মের উন্নতি হইবেই।

সেই সময়ে সমাজের ব্যবস্থার জন্য কত উন্নত রাজনিয়ম হইয়াছিল, তাহা জানিতে ইচ্ছা করিলে মনু পড়। সেই সকল রাজ-নিয়মের শাসনেই সকল রাজারাই চলিতেন; সেই মানব ধর্ম্ম সকল রাজাদিগেরই মাননীয়

ছিল, কেহই তাহা অতিক্রম করিতে পারিত না। ক্রমে ক্রমে আর্য্যদিগের সভ্যতার ভদ্রতার উন্নতি হইল। রাজনীতি যিনি রচনা করিয়াছেন, তাহা দেখিলেই বুঝা যায় যে সেই রচয়িতার কতদূর জ্ঞান ও ধর্ম্মের উন্নতি হইয়াছিল। আর্য্যেরা প্রথমে পশুপালক ছিল, ক্রমে ক্রমে তাহা হইতেই বিক্রমশালী রাজা হইলেন। আবার শাস্ত্রকারদিগের প্রভাবেও রাজ্যের অনেক উন্নতি হইয়াছিল। বলবীর্য্যের প্রভাবে, জ্ঞানধর্ম্মের প্রভাবে আর্য্যদের উন্নতি হইয়াছিল বটে, কিন্তু এই সমস্তই ঈশ্বরের প্রসাদে; ঈশ্বরের প্রসাদ সকলের উপরে; তাঁহার প্রসাদ না পাইলে কোনও কার্য্যই সিদ্ধ হয় না।

ঈশ্বরের মঙ্গল ইচ্ছা যে জ্ঞানধর্ম্মের উন্নতি হউক; ইহা যে কেবল পৃথিবীতেই হইবে, তাহা নহে—ইহা নিত্যকাল চলিবে! সেই জ্ঞানধর্ম্মের উন্নতি অনন্তকাল রহিল, এ কেমন

ঈশ্বরের করুণা! মনুষ্যদিগকে কেবল পৃথিবীর জীব করিয়া সৃষ্টি করেন নাই—সে স্বর্গলোক হইতে স্বর্গলোকে যাইবে; এই কারণে ঈশ্বর মনুষ্যকে জ্ঞানধর্ম্মমূলক বিজ্ঞান দিয়াছেন।

আবার দেখ, যেমন শরীরপোষণের নিমিত্ত ঈশ্বর কতকগুলি অভাব দিয়াছেন, সেইরূপ আত্মার উন্নতির জন্যও একটা অভাব দিয়াছেন; সে কি, না, ঈশ্বর-স্পৃহা। ক্ষুধা তৃষ্ণা শান্তি করিবার জন্য মনুষ্য তত লালায়িত নয়; কিন্তু ঈশ্বর—সত্য ঈশ্বরকে পাইবার জন্য হৃদয়ে একটী বলবতী স্পৃহা আছে। এই স্পৃহা দেবস্পৃহনীয় স্পৃহা; এই যে আত্মার স্পৃহা হৃদয়ে মুদ্রিত আছে, এই স্পৃহা দেবতাদিগের লোভনীয়। এই স্পৃহা চরিতার্থ করিতে গিয়া জ্ঞানবিজ্ঞানের যেমন উন্নতি, তেমন উন্নতি শরীরের অভাব দূর করিতে গিয়া হয় নাই। এই স্পৃহা চরিতার্থ করিবার জন্য মনুষ্য গৃহ

সংসার ছাড়িয়া অরণ্যে ঘুরিতেছে; সকল-প্রকার ভোগ হইতে বিরত হইতেছে; তরু-মূলেই বাস করিল; ভূতলেই শয়ন করিয়া রহিল; ভিক্ষান্ন যত পাইল, তাহাতেই ক্ষুধা-নিবৃত্তি করিল। যে সাধকের হৃদয়ে এই ঈশ্বরস্পৃহা অত্যন্ত বলবতী, তাঁহার ঈশ্বর ভিন্ন আরামই নাই। ঈশ্বরকে না পাইয়া মানুষ সুখশান্তি লাভ করিতে পারে না। এই স্পৃহা চরিতার্থ করিবার জন্য জ্ঞানধর্ম্মের কেমন উন্নতি হইল। কেবল এই এক স্পৃহা আত্মায় মুদ্রিত করিয়া দেওয়াতে জ্ঞানধর্ম্মের অনন্ত কালের জন্য উন্নতি হইল। ঈশ্বর সত্য-কাম সত্যসংকল্প; তাঁহার যে জ্ঞানধর্ম্মের উন্নতির ইচ্ছা, কেবল একটী স্পৃহা দিয়া সেই উন্নতি সাধন করিতেছেন।

যেমন সকল বিষয়ে ক্রমে ক্রমে উন্নতি হয়, ঈশ্বরলাভ বিষয়েও তেমনি। প্রথমে দেখ আর্য্যদের মধ্যে কেমন ঈশ্বর-স্পৃহা আসিল,

তাহার পরে সেই স্পৃহা কেমন স্ফূর্ত্তি পাইতে লাগিল, কেমন কার্য্য করিতে লাগিল।

প্রথম ঈশ্বর-স্পৃহার উদ্রেক হইল কি প্রকারে? আর্য্যেরা আপনার ইচ্ছাতে কৃষি-বাণিজ্য করিয়া শরীরপোষণ করিতেন, কত সময়ে ইচ্ছামত ফল না পাইয়া আপনার দুর্ব্বলতা দেখিতে পাইলেন;—বীজরোপণ করিলেন, কিন্তু বৃষ্টি না হওয়াতে শস্য হইল না। তাঁহারা দেখিলেন যে আপনার ইচ্ছামত কিছুই করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না; ক্রমে আপনার দুর্ব্বলতা প্রকাশ হইয়া পড়িল। তাঁহারা নানা প্রকার উৎপাত ঘটিতে দেখিয়াও মনুষ্যের দুর্ব্বলতা বুঝিতে পারিলেন। তখন তাঁহারা বুঝিলেন যে এই সকলের উপরে আর কাহারও কার্য্য আছে, আর কাহারও প্রসন্নতা আবশ্যক আছে, যাহাতে আমরা ইচ্ছা সফল করিতে পারি। তখন ঈশ্বরের আবশ্যকতা অনুভব করিলেন, তখন মনে হইল যে ঈশ্বর

আছেন। সূর্য্য উত্তাপ দিতেছে, তাই শস্য হইতেছে; অতিরিক্ত উত্তাপ হইলেই সমস্ত শস্য শুকাইয়া যায়। এই সকল দেখিয়া তাঁহারা সূর্য্যকে এক দেবতা মনে করিলেন; তাঁহারা ভাবিলেন যে সূর্য্যের ভিতরে এক চৈতন্য আছে—মনুষ্য অপেক্ষা সূর্য্যের অধিক ক্ষমতা আছে। ধর্ম্মের প্রথম উদ্রেকে এই হইল. যে আর্য্যেরা খুঁজিয়া যখন ঈশ্বরকে পাইলেন না, তখন সূর্য্যকেই দেবতা মনে করিলেন; মনে করিলেন সূর্য্যই উপকার করিতেছেন, তাঁহারই প্রসন্নতা চাই, তবে আমাদের সংসার চলিবে। তেমনি তাঁহারা মেঘের মধ্যে ইন্দ্রদেবকে দেখিলেন; বায়ুর মধ্যে প্রত্যক্ষ দেবতা দেখিলেন। ঈশ্বরকে চাই এই তাঁহাদের মনে হইয়াছিল, কিন্তু তখন তাঁহারা জ্ঞানের দ্বারা কিছুই প্রকাশ করিতে পারিলেন না। তখন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য যে সকল জড় বস্তু, তাহাদিগকেই তাঁহারা দেবতা

বলিয়া, পূজা করিতে লাগিলেন। যে জ্ঞান অনন্তকালের উন্নতিতে লইয়া যাইবে, তাহার প্রথম উদ্রেকের সময় আর্য্যদিগের মধ্যে কি হইল দেখ। ঈশ্বর চাই, এই তাঁহাদের স্পৃহা; সেই স্পৃহা চরিতার্থ করিবার জন্য তাঁহারা জ্ঞান-অভাবে চন্দ্র সূর্য্যকে আরাধনা করিতে লাগিলেন। যুদ্ধের সময়ে ভাবিলেন যে ইন্দ্রই দস্যুদিগকে পরাজয় করিয়া আর্য্যদিগকে জয়-যুক্ত করিতেছেন। এই সকল দেবতার আরাধনার জন্য যত যাগযজ্ঞের কল্পনা।

সেই সূর্য্যদেবতাকে সেই নবীন চক্ষে আর্য্যেরা কি যে আনন্দরূপে দেখিয়াছিলেন, তাহা ঋগ্বেদের মন্ত্রেই প্রকাশ পাইতেছে। ঋগ্বেদে আছে—

"কেতুং কৃণ্বন্নকেতবে পেশোমর্য্যা অপেষসে।
সমুষদ্ভিরজায়ত ॥"

নিদ্রাতে অভিভূত অচেতন জীবকে চেতন দিয়া এবং অন্ধকারে আচ্ছন্ন রূপহীন পদার্থকে

নানাবর্ণ দিয়া উষার সহিত প্রতিদিন সূর্য্য উদয় হয়েন। যখন সকলে অচেতনের নিদ্রায় অভিভূত রহিয়াছে, তখন সূর্য্য মৃতপ্রায়কে চেতনা দিলেন; বর্ণহীনকে সূর্য্য আপনার বর্ণের দ্বারা রঞ্জিত করিয়া দিলেন। এই সূর্য্য-দেবতাকে ঋষিরা কি উৎসাহেরই সহিত দেখিতেন—আপনার সখা বন্ধু প্রভৃতি কত ভাবেই দেখিতেন। আর্য্যেরা যুদ্ধে জয়ী হইয়া এইরূপে ইন্দ্রের জয়ধ্বনি করিতেন "মহিত্বমস্তু বজ্রিণে" বজ্রযুক্ত ইন্দ্রের মহত্ত্ব হউক, ইন্দ্রের জয় হউক।

সূর্য্য দ্যুলোকের দেবতা, অগ্নি হইলেন পৃথিবীর দেবতা; এই অগ্নি একেবারে গৃহ-দেবতা হইয়া পড়িলেন।—সেই গৃহদেবতাকে প্রতিদিন প্রভাতে উঠিয়া সমিধ দিতে হইত। সেই অগ্নিদেবতা আবার দেবতাদিগের দূত হইলেন; যাহা কিছু দেবতার উদ্দেশে দিবার আবশ্যক হইত, তাহা অগ্নিতে দিতে হইত।

অগ্নিতে দিলেই সকলই ভস্ম হইয়া যায়, তাহাতেই আর্য্যেরা মনে করিতেন যে অগ্নি সেই সকল দ্রব্য দেবতাদের নিকটে লইয়া যাইবেন। যখন কাহারও জন্ম হইল, তখন অগ্নিতে হোম করিয়া জাতকর্ম্ম হইল; যখন মৃত্যু হইল, তখন সেই মৃত ব্যক্তিকে অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া হইল। তাঁহারা ভাবিতেন যে সেই অগ্নিই ত্যহার আত্মাকে উপযুক্ত লোকে লইয়া যাইতে পারিবে। পূর্ব্বে প্রত্যেক আর্য্যের গৃহে এক একটি অগ্নি-শালা থাকিত।

প্রথম যে ঈশ্বরস্পৃহা হইল, তাহার বিষয় আলোচনা করিতে গিয়া কত বিষয় জানা গেল। সেই আর্য্যেরা যাগযজ্ঞ লইয়াই আনন্দে থাকিতেন। অগ্নিতে আহুতি দিয়া, দেবতা-দিগের প্রতি যে ভক্তি আছে, তাহাই চরি-তার্থ করিতেন; দেবতারা যে উপকার করি-তেন, তাহারই জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি-

তেন। আর্য্যেরা সেই প্রথম ঈশ্বরস্পৃহা চরিতার্থ করিতে গিয়া দ্যুলোকে, ভূলোকে, অন্তরীক্ষে দেবতা সকল কল্পনা করিলেন। তাঁহারা আপনারা যে সকল দ্রব্য ভাল বাসিতেন তাহাই দেবতাদিগের আহারের নিমিত্ত অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিতেন। মাংস, পুরোডাশ (চালের রুটি), চরু, ঘৃত, দুগ্ধ প্রভৃতি অগ্নিতে আহুতি দিতেন। আর্য্যেরা অনেক দিন পর্য্যন্ত এই প্রকার যাগযজ্ঞে মত্ত ছিলেন। এখনও সেই যাগযজ্ঞের ছায়া ভারতবর্ষে বিস্তৃত আছে।

দ্বাদশ উপদেশ—ঈশ্বরলাভ।

১৮ই জ্যৈষ্ঠ, রবিবার ৬২ ব্রাহ্ম সম্বৎ ১৮১৩ শক।

মনুষ্যেরা ঈশ্বরের অভাব সর্ব্বদাই বোধ করে; ঈশ্বর বিনা মনুষ্যেরা এক পদও চলিতে পারে না। অতিবুদ্ধি ব্যক্তিরা ঈশ্বরকে পরি-

ত্যাগ করিতে চাহে। ঈশ্বর অন্তরে আঘাত করেন, তাহারা কবাট বন্ধ রাখে ; তাহাদিগের অন্তরে লৌহকবাট—ঈশ্বর সজোরে আঘাত করেন, তাহারা সেই কবাট ততই বন্ধ করিতে চাহে। কিন্তু যখন সেই কঠোরহৃদয়দিগের মধ্যে কেহ কোন কার্য্যক্রমে নৌকাতে চড়িয়া আসিতেছে, আর এমন সময়ে যদি সেই নৌকা ঝড়ে তুফানে মগ্নপ্রায় হয়, তখন সে প্রাণভয়ে ভীত হইয়া "হা ঈশ্বর রক্ষা কর, হা ঈশ্বর রক্ষা কর" বলিয়া চীৎকার করিতে থাকে। মনুষ্যেরা বিপদে আকুল হইয়া ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করে। বিপদের সময় "হা ঈশ্বর রক্ষা কর" বলিয়া প্রার্থনা করিলে ; আবার সম্পদের সময় ভক্তি কাহাকে দিবে? ঈশ্বরকে অর্পণ না করিলে ভক্তি সার্থকতা লাভ করিতে পারে না ; তাঁহাকে প্রীতিপূজা না দিলে, প্রেমের সহিত পূজা না করিলে প্রেম চরিতার্থ হয় না।

আর্য্যেরাই ঈশ্বরের অভাব অধিক প্রতীতি করিয়াছিলেন; জ্ঞানের অপেক্ষা তাঁহাদের ধর্ম্মভাব অধিক প্রজ্বলিত ছিল। তাঁহারা অন্বেষণ করিতেছিলেন, কে তাঁহাদিগকে রক্ষা করিতেছেন, কে-ই বা শস্যসম্পত্তি বিতরণ করিতেছেন, কে-ই বা ক্ষুধার অন্ন দিতেছেন। তখন উপরে চাহিয়া সূর্য্যকে দেখিয়া ভাবিলেন যে সূর্য্যই দেবতা। তখন বলিলেন "জানিয়াছি, এই সূর্য্যই আমাদের দেবতা; ইনি-ই আমাদিগের শস্য দিতেছেন, সকল প্রয়োজনীয় বস্তু দিতেছেন। তাঁহারা জ্ঞানের যে পরম বস্তু, সত্যবস্তু, তাহা জানিতে পারিলেন না; জ্ঞানের অভাবে এই কল্পনা করিলেন যে সূর্য্য চেতন বস্তু—তিনিই আমাদের মঙ্গলের জন্য আলোক দিতেছেন"। সূর্য্যের জ্বলন্ত জ্যোতি দেখিয়া, সূর্য্য ভিন্ন মনুষ্যের জীবন থাকিতে পারে না বুঝিয়া, তাঁহারা সূর্য্যকেই রক্ষাকর্ত্তা দেবতারূপে বরণ করিলেন।

এখানে বৃষ্টি না হইলেও শস্য হয় না; তাই ক্রমে ইন্দ্রও আর এক দেবতা হইলেন। তাঁহারা ইন্দ্রদেবকে সকল সময়ের, বিশেষতঃ যুদ্ধ সময়ের সহায় ভাবিতে লাগিলেন। আর্য্যেরা এই প্রকার সমস্তই নবীন নেত্রে দেখিতে লাগিলেন; চর্ম্মচক্ষুতে যাহা প্রকাশ পাইল, তাহাদের মধ্যে যাহার অধিক ক্ষমতা দেখিলেন, যাহাকে মনুষ্যের, উপকারী বোধ করিলেন, তাহাকেই সহায়, সখা, দেবতারূপে অর্চ্চনা করিলেন। ইন্দ্র সূর্য্য প্রভৃতি দেবগণের পূজার নিমিত্ত যাগযজ্ঞের একটা একটা বিধান হইল। আর্য্যদের অন্তর হইতে কৃতজ্ঞতা-প্রকাশ-সূচক স্তুতি ও গান বাহির হইতে লাগিল—কবিতা উঠিল। ইহাই ঋগ্বেদ ও সামবেদে প্রকাশিত হইয়াছে।

আবার এই সকল দেবতাদিগের মধ্যে অগ্নিদেবতাকে দূতপদে স্থাপিত করা হইল। অগ্নিই গৃহদেবতা হইলেন, অগ্নিই পুরোহিত

হইলেন। অগ্নিই গৃহের রক্ষাকর্ত্তারূপে রহি-লেন। আর্য্যেরা জাতকর্ম্ম হইতে মৃত্যু অবধি সকল কর্ম্মে অগ্নির আরাধনা করিতেন। তাঁহারা ভাবিতেন যে মৃত্যুর পরে অগ্নি পুণ্যাত্মাকে তাঁহার উপযুক্ত পুণ্যলোকে লইয়া যাইবেন। ঋগ্বেদের প্রথমেই দেখা যায় অগ্নির স্তব। আর্য্যেরা যে দ্রব্য নিজে ভাল বাসি-তেন, তাহাই অগ্নিতে আহুতি দিতেন; শেষ প্রসাদ আপনারা খাইতেন। অশ্ব গো ছাগ মেষ প্রভৃতি পশুদের বিশেষ বিশেষ অঙ্গ বিশেষ বিশেষ দেবতাকে আহুতি দিতেন। অগ্নি যেমন গৃহদেবতা ছিলেন, তিনি হোতাও ছিলেন—তিনি অন্যান্য দেবতাকে আহ্বান করিতেন, নিমন্ত্রণ করিতেন।

আর্য্যেরা আরও দেখিয়াছিলেন যে, ধর্ম্ম-ভাব আমাদের অন্তরেই আছে; পুণ্য পাপ, আত্মগ্লানি, আত্মপ্রসাদ আমাদের আত্মাতেই রহিয়াছে। নৈতিক নিয়ম, নৈতিক আদর্শ

(moral type) সকলেরই অন্তরে আছে। সেই নৈতিক নিয়মই সকল কর্ম্মে স্বেচ্ছাচারিতার প্রতিবন্ধকতা করে। প্রবৃত্তি চরিতার্থ কর—ধর্ম্মের বিরোধে করিতে পারিবে না, ধর্ম্মের অনুমোদনে করিতে পারিবে। এইরূপ প্রবৃত্তির বিপক্ষে চলা সহজ নহে। আর্য্যেরা যখন ধর্ম্মাচরণ করিতে গিয়া সকল সময়ে ধর্ম্মরক্ষা করিতে পারিলেন না; একান্ত চেষ্টাতেও মধ্যে মধ্যে স্খলিতপদ হইয়া আত্মগ্লানিতে অস্থির হইলেন, তখন তাঁহাদের আপনাদের দুর্ব্বলতা পরিহারের জন্য দেবতার সাহায্য আবশ্যক বোধ করিলেন। তাঁহাদের মনে হইল "কে আমাকে উদ্ধার করিবে?" তাঁহারা কাঁদিতে লাগিলেন "পাপে মলিন হয়ে কত আর সহিব, কার কাছে কাঁদিব হে অনাথ-শরণ।" তখন তাঁহারা কল্পনা করিলেন "যিনি সমুদ্রের অধিপতি—বরুণ দেবতা, তিনিই আমাদের পাপ মোচন করিবারও দেবতা।"

বেদের মধ্যে এই প্রার্থনার ভাব বো্‌ রহি-য়াছে। বশিষ্ঠ ঋষিও একবার পাপে পড়িয়া এই প্রার্থনা করিয়াছিলেন

"কিমাগ আস বরুণ জ্যেষ্ঠং যৎস্তোতারং জিঘাংসসি সখায়ং প্রতন্মেহবোচো তূড়ভস্বধাবোহবত্বনেনা নমসা তুর ইয়াং।"

হে বরুণদেব, আমি কি গুরুতর পাপ করিয়াছি যে, তোমার স্তোতা, তোমার সখা যে আমি, আমাকে বিনাশ করিতে ইচ্ছা করিতেছ? হে দুর্দ্ধর্ষ, হে তেজস্বিন্, সেই পাপ আমাকে বলিয়া দাও তাহা হইলে আমি নিষ্পাপ হইয়া তোমাকে নমস্কার করিয়া তোমার নিকটে উপস্থিত হইতে পারি। আর্য্যেরা ঐ সকল দেবতার উদ্দেশে ঋগ্বেদে স্তুতি করিলেন, সামবেদে গান করিলেন এবং যজুর্ব্বেদে যজ্ঞের বিধান করিলেন; উহাই তাঁহাদের ভজনসাধন সকলই। আর্য্যেরা প্রতিকর্ম্মেতে আপনার পরিবারের ন্যায় দেবতাদিগকে আহ্বান করিতেন।

আর্য্যদিগের মধ্যে তখনও লেখাপড়ার চলন হয় নাই, তাই তাঁহারা দেবগণের স্তুতি-সূচক ঋক্ সকল মুখে মুখে শিক্ষা দিতেন, শিষ্যেরা শ্রবণ করিতেন; এই জন্য তাহার নাম হইল শ্রুতি। এই শ্রুতি নিজেদের মধ্যে প্রচলিত করিবার কেমন উপায় করিলেন। উপনয়নের জন্য পিতা পুত্রকে গুরুকুলে পাঠাইতেন। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন বর্ণেরই উপনয়ন আছে। ব্রাহ্মণের পবিত্রতা-সূচক কার্পাসের উপবীত, ক্ষত্রিয়ের ধনুর্জ্যা-সূত্রের উপবীত এবং বৈশ্যের পশুলোমের উপবীত। কিন্তু পূর্ব্বে আর্য্যেরা মৃগদের মধ্যে বাস করিতেন, এই কারণে প্রথমে মৃগচর্ম্মের উপবীত দিয়া পরে বিভিন্ন প্রকার উপবীত দেওয়া হইত এবং এখনও সেই প্রথার ছায়ামাত্র আছে। উপনয়নের পর হইতেই শিষ্য বেদ শিক্ষা করিতেন; কেহ তিন বৎসর, কেহ দ্বাদশ বৎসর, কেহ বা ছত্রিশ বৎসর পর্য্যন্ত

গুরুগৃহে থাকিয়া বেদমন্ত্রসকল শিক্ষা করিতেন। এইরূপে শিক্ষার এক সুন্দর প্রণালী স্থাপিত হইল। এই প্রণালীর বলেই যাগযজ্ঞ প্রভৃতি সকলই প্রায় ঠিক চলিয়া আসিতে লাগিল—কিছুরই পরিবর্ত্তন হইল না। গুরুর প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি অক্ষুণ্ণ থাকিল। ব্রাহ্মণদিগের এই শিক্ষাপ্রণালীর বলে, যদিও কেহই পুরাকালের কিছুই বুঝে না, কিছুই করে না, তথাপি সেই পুরাতনের ছায়া ছাড়াইতে পারিতেছে না। তখন যাহা জীবন্ত ছিল, এখন তাহা মৃত ছায়ারূপ ধারণ করিয়াছে; এখনও সেই ছায়ার উপাসনা আর কতদিন থাকিবে?

আর্য্যদের মধ্যে ঈশ্বরজ্ঞানের অঙ্কুরের বিষয়, ঈশ্বরস্পৃহার বিষয় বলিয়াছি। ক্রমে ক্রমে সেই ঈশ্বরস্পৃহা তাঁহাদের মধ্যে কেমন প্রস্ফুটিত হইতে লাগিল, কেমন কার্য্য করিতে লাগিল। যখন যাগযজ্ঞ খুব বিস্তারিত হইয়াছিল, তখন কোন কোন সত্যসন্ধায়ী

ঋষিরা বলিলেন যে “এই সকল দেবতা পরিমিত-শক্তি দেখিতেছি—কেহ জল দিতেছেন, কেহ বা তেজ দিতেছেন; কিন্তু ইহাঁরা আসিলেন কোথা হইতে—ইহাঁদের নিয়ন্তা কে?” দেবতারা কোথা হইতে আইলেন, কি প্রকারে আইলেন, এবং ইহাঁদের নিয়ন্তা কে এই লইয়া ঋষিদিগের মধ্যে একটা আন্দোলন উপস্থিত হইল। অবশেষে স্থির হইল যে, যাঁহা হইতে দেবতারা আসিয়াছেন, তাঁহা হইতেই ভূলোক, তাঁহা হইতেই দ্যুলোক হইয়াছে। “দ্যাবাভূমী জনয়ন্ দেব একঃ।” আর্য্যেরা এতদিন সূর্য্য অগ্নি প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জড়বস্তুকে ঈশ্বর বলিয়া পূজা করিতেন; এখন বুঝিতে পারিলেন যে সেই সকল দেবতাদিগের উপরে আর এক মহেশ্বর আছেন। তাঁহারা বলিলেন—

“তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং
তং দেবতানাং পরমঞ্চ দৈবতং।

পতিং পতীনাং পরমং পরস্তাৎ
বিদাম দেবং ভুবনেশমীড্যং ॥”

দেখ, জ্ঞান কেমন প্রকাশ হইল। ঈশ্বরের মঙ্গল ইচ্ছা এই যে জ্ঞানধর্ম্মের উন্নতি হউক। এই জ্ঞানধর্ম্মেরও উন্নতি ক্রমে হয়, একদিনে হয় না। ঈশ্বর জ্ঞানধর্ম্ম আমাদের অন্তরে এরূপ ভাবে দিয়াছেন, যে নিজের যত্ন বিনা তাহা সিদ্ধ হয় না; ঈশ্বর স্বাধীনতা দিয়া আমাদের নিজের যত্নের উপর নির্ভর করিতে দিয়াছেন। এমন যে কঠিন ব্রত—জ্ঞানধর্ম্মের উন্নতি, ইহাতে মনুষ্য আপনার ইচ্ছায় অগ্রসর হইবে; আপনার ইচ্ছা যদি না থাকে, কখনই অগ্রসর হইতে পারিবে না। যে চেষ্টা করিবে, তাহাকেই ঈশ্বর সাহায্য করিবেন। যে ব্যক্তি যেমন চেষ্টা করিতে পারে, সেই অনুসারেই তাহার জ্ঞান প্রস্ফুটিত হয়, তাহার ধর্ম্মের বল হয়। আপনি সাধনা না করিয়া কোন ক্রমেই পরমস্থানে যাইতে পারিবে না। তুমি

নিজে চেষ্টা না করিলে জ্ঞানও নিজে তোমার কাছে উপস্থিত হইবে না; আপনি চেষ্টা কর, ঈশ্বরের প্রসাদ হইবে। ঋষিরা প্রথমে যত আপদ বিপদ হইতে রক্ষা করিবার জন্য ঈশ্বরের প্রয়োজন বুঝিয়াছিলেন; সেই প্রয়োজন বুঝিয়া পরিমিত দেবতাদিগের উপাসনা আরম্ভ করিয়াছিলেন। তাঁহারা ক্রমে আপনার চেষ্টা দ্বারা, যত্নের দ্বারা, আপনার সাধনা দ্বারা, বুঝিলেন যে, সেই চন্দ্র সূর্য্যদিগের উপরেও এক দেবতা আছেন—ইহাদিগের উপরেও পরম ঈশ্বর আছেন; সেই সর্ব্বশক্তি সর্ব্বনিয়ন্তা পুরুষ পরমেশ্বর হইতেই ইহারা শক্তি পাইয়াছে।

কেনোপনিষদের দ্বিতীয় ভাগে এক আখ্যায়িকা আছে, তাহাতে, ঋষিরা যে এই দেবতাদিগকে পরিমিত বলিয়া বুঝিয়াছিলেন তাহা সুন্দররূপে প্রকাশ হইয়াছে। দেবতারা অসুরদিগের সহিত যুদ্ধে জয়ী হইয়া ভাবিতে লাগিলেন যে, তাঁহাদেরই মহিমায় জয় লাভ

হইয়াছে। তখন ব্রহ্ম ভাবিলেন যে দেবতারা এত শ্রেষ্ঠ হইয়াও এত অভিমানী—আবার বা তাঁহারা শ্রেষ্ঠ অধিকার হইতে বিচ্যুত হন। তাঁহাদের জ্ঞান উদ্রেক করিবার জন্য জ্যোতির্ম্ময়রূপে ব্রহ্ম তাঁহাদের সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন "তেভ্যোহ প্রাদুর্বভূব"। দেবতারা তাঁহার তীব্র জ্যোতি দেখিয়া জানিতে পারিলেন না যে তিনি কে। সকলে পরামর্শ করিয়া তখন অগ্নিকে এই জ্যোতির বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়া আসিতে বলিলেন। অগ্নি নিকটে উপস্থিত হইলেই সেই প্রাদুর্ভূত জ্যোতি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "কোহসি, তুমি কে?" অগ্নি বলিলেন "জান না আমি কে? আমি অগ্নি, আমি জাতবেদা।" সেই জ্যোতি বলিলেন "কি তোমার শক্তি?" অগ্নি বলিলেন "আমার শক্তি কি? সমুদয় জগত দহন করিতে পারি" সেই জ্যোতি একটী তৃণ অগ্নির সম্মুখে ধরিয়া বলিলেন "ইহাকে দগ্ধ

করু।” কিন্তু অগ্নি তাঁহার সমুদয় চেষ্টাতে সেই ক্ষুদ্র তৃণকেও দগ্ধ করিতে সমর্থ হইলেন না। তখন অগ্নি ভয় পাইয়া পলায়ন করিলেন। অগ্নি দেবতাদিগের নিকট আসিয়া বলিলেন যে “ইহাঁকে জানিতে পারিলাম না—ইনি কে?” তখন দেবতারা বায়ুকে পাঠাইলেন। বায়ু সেখানে উপস্থিত হইলেই সেই জ্যোতি জিজ্ঞাসা করিলেন “তুমি কে?” বায়ু বলি-লেন “আমি বায়ু, আমার নাম মাতরিশ্বা”। সেই জ্যোতি বলিলেন “তোমার শক্তি কি?” বায়ু বলিলেন “আমি ইচ্ছা করিলেই জগতের তাবৎ পদার্থ চূর্ণ বিচূর্ণ করিতে পারি, সকলই উড়াইয়া দিতে পারি।” সেই জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ পূর্ব্বের ন্যায় একটী তৃণ বায়ুর সম্মুখে রাখিয়া উড়াইয়া দিতে বলিলেন; কিন্তু বায়ু তাঁহার সমুদয় শক্তি একত্রিত করিয়াও সেই তৃণটীকে উড়াইতে সমর্থ হইলেন না। তখন আবার বায়ু ফিরিয়া গিয়া দেবতাদিগকে বলি-

লেন "আমি ইহাঁকে জানিতে পারিলাম না—ইনি কে ?" তাঁহারা এবারে ইন্দ্রকে পাঠাইলেন। ইন্দ্র রাজ-অভিমানে অভিমানী হইয়া চলিলেন। ব্রহ্ম এই দেবরাজ ইন্দ্রের এত অভিমান দেখিয়া অন্তর্দ্ধান হইলেন। গর্ব্বিত ব্যক্তি ঈশ্বরের সাক্ষাৎ পায় না; দীন হীন ব্যক্তিকেই তিনি দেখা দেন। ইন্দ্র সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া দেখেন যে জ্যোতির্ম্ময় পুরুষের পরিবর্ত্তে এক শোভনা অলঙ্কারবতী স্ত্রী দাঁড়াইয়া আছেন। তাঁহার নাম উমা—তিনিই ব্রহ্মবিদ্যা। ইন্দ্র তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "এইখানে যে জ্যোতি ছিলেন, তিনি কে ?" ব্রহ্মবিদ্যা বলিলেন "তাঁহাকে তুমি জান না ? তিনি যে ব্রহ্ম; তোমরা ব্রহ্মের জয়ে আপনার মহিমা ঘোষণা করিতেছিলে ?" ইন্দ্র প্রথমে ব্রহ্মজ্ঞান পাইলেন, তাই ইন্দ্র বড়। পরে তাঁহার কাছে দেবতারা ব্রহ্মজ্ঞান পাইলেন, তাই দেবতারা বড়। তাঁকে যাঁহারা

জানিবেন তাঁহারাই বড়, তাঁহারাই ভাগ্যবান্। ধনসম্পত্তি বিষয় বিভব থাকিলেই ভাগ্যবান্ হয় না; তাঁকে যে পায়, সেই ভাগ্যবান্।

"যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকন্ততঃ।
তস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে॥"

যাঁহাকে লাভ করিলে অন্য লাভ অধিক বলিয়া বোধ হয় না, তাঁহাতে সংস্থিত হইলে গুরু বিপদও আমাদিগকে বিচলিত করিতে সমর্থ হয় না। এখন দেখ ক্রমে ক্রমে আর্য্যদের মধ্যে জ্ঞানধর্ম্মের কেমন উন্নতি হইয়াছিল।

ত্রয়োদশ উপদেশ—আর্য্যদের ব্রহ্মোপাসনা।

(২৫শে জ্যৈষ্ঠ, রবিবার ৬২ ব্রাহ্ম সম্বৎ ১৮১৩ শক।)

আর্য্যেরা পূর্ব্বে গো, অশ্ব, ছাগ, মেষ, স্ত্রী পুত্র লইয়া ভ্রমণ করিয়াই বেড়াইতেন। যখন এদেশে আসিয়া তাঁহাদের ইহা মনোনীত হইল; এখানকার শ্রীসৌন্দর্য্য সকল প্রতীতি

করিলেন; এখানকার সুখদ ঋতু সকল ভোগ করিয়া পরিতৃপ্ত হইলেন, তখন তাঁহারা বহু ভ্রমণের শ্রান্তি দূর করিয়া এখানে বসতি করিলেন। যখন আর্য্যেরা এখানে আসিয়া বসতি করিলেন, তাঁহারা প্রতিজনেই গৃহস্থ হইলেন —প্রত্যেকেই এক একটী গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া স্ত্রী পুত্রগণের সহিত বাস করিতে লাগিলেন। ক্রমে যখন অনেক গৃহস্থ একত্র বাস করিতে লাগিলেন, তখন একটী পল্লী হইল। যখন অনেক পল্লী একত্র হইল, তখন একটী সমাজ হইল। তাঁহারা সামাজিক নিয়মে আবদ্ধ হইলেন। এইরূপে তাঁহাদের মধ্যে ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা হইল। গৃহস্থেরাই ধর্ম্মের উন্নতি করিতে লাগিলেন। পিতা মাতাকে ভক্তি করা, পুত্রকন্যার এই ধর্ম্ম হইল; আবার পুত্রকন্যাকে স্নেহের সহিত রক্ষা ও পালন করা, যত্নের সহিত তাহাদিগকে জ্ঞানশিক্ষা দেওয়া— ইহা পিতা মাতার ধর্ম্ম হইল। ভ্রাতাদিগের

মধ্যে ভ্রাতৃসৌহার্দ্দ আসিল। প্রতিবাসীদের প্রতি যেরূপ ঔদার্য্যের সহিত ব্যবহার করিতে হইবে, তাহাও এক ধর্ম্ম হইল। যখন সকল গৃহস্থই স্বাধীনভাবে আপনার পরিশ্রমে ধন ধান্য উৎপন্ন করিয়া আপনার আপনার গৃহ প্রতিপালন করিতে লাগিলেন, তখন ধর্ম্মবৃত্তি দ্বারা তাঁহারা বুঝিলেন যে, অপরের ধন অপহরণ করা উচিত নহে; ন্যায়োপার্জ্জিত বিত্তের দ্বারা গৃহ প্রতিপালন করিতে হইবে। এইরূপে অপরের ধন অপহরণ করা অন্যায়, এই এক ধর্ম্ম আসিল। আবার যখন তাঁহারা দেখিলেন যে, সকলেই আপনার আপনার উপযুক্ত ধন ধান্য আহরণ করিতে পারিল না, তখন তাহাদের অভাব পূরণ করিবার নিমিত্ত দয়াবৃত্তি আসিল। দেখ, এই হৃদয়ের ন্যায়, দয়া, ধর্ম্মভাব সকলই গৃহজাত ফল। আবার দেবতাকে প্রীতি ভক্তি করিয়া, তাঁহার শরণাপন্ন হইয়া গৃহধর্ম্ম পালন করা তাঁহাদের নিতান্ত

কর্ত্তব্য কর্ম্ম বোধ হইল। তাঁহারা গৃহের আপদ বিপদ দূর করিবার জন্য দেবারাধনা আবশ্যক বোধ করিলেন। এই যে ধর্ম্মের একটী বন্ধন দাঁড়াইল আর্য্যেরা আপনাদের দুর্ব্বলতাবশতঃ সকল সময়ে তদনুসারে আচরণ করিতে পারিতেন না; মধ্যে মধ্যে তাঁহাদের ধর্ম্ম হইতে পদ স্খলিত হইত এবং আত্মগ্লানির কঠোর আঘাতে তাঁহারা অস্থির হইতেন। তখন তাঁহারা আপনার আপনার আরাধ্য দেবতার নিকটে গিয়া পাপ হইতে পরিত্রাণের জন্য ব্যাকুলভাবে প্রার্থনা করিয়া শান্তিলাভ করিতেন।

আর্য্যেরা ইন্দ্রিয়গোচর সূর্য্য চন্দ্র পর্জ্জন্য বায়ু প্রভৃতিকে আপনাদের দেবতা বলিয়া জানিতেন এবং যাগ যজ্ঞাদি দ্বারা তাঁহাদের আরাধনা করিতেন। তাঁহাদের বিশ্বাস ছিল যে ঐ সকল দেবতার আরাধনাতে এলোকে দুঃখ ক্লেশ হইতে, পাপ তাপ হইতে পরিত্রাণ পা-

ইয়া সুখভোগ এবং পুণ্যলাভ করিবেন ; মৃত্যুর পরে স্বর্গলাভ করিবেন এবং স্বর্গে পুণ্যের ফল-ভোগ করিবেন।

তাঁহাদের মধ্যে কতকগুলি উন্নতমনা ঋষি এপ্রকার অকিঞ্চিৎকর ধর্ম্মে সন্তুষ্ট হইলেন না এবং জ্ঞানের তৃপ্তিলাভ করিলেন না। তাঁহারা গৃহকর্ম্ম, সামাজিক কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া, স্ত্রী-ঐষণা বিত্তৈষণাতে বিরক্ত হইয়া, অরণ্যে যাই-য়া ঈশ্বরের স্বরূপভাব লাভ করিবার জন্য, আ-ত্মজ্ঞানের জন্য কায়মনোবাক্যে ধ্যানধারণায় নিযুক্ত হইলেন। তাঁহারা সকল প্রকার বিষয়-স্পৃহা পরিত্যাগ করিলেন এবং ভিক্ষাবৃত্তি অবল-ম্বন করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে লাগি-লেন। এই অরণ্যে ঋষিরা অনেক কাল একা-গ্রচিত্ত হইয়া পরস্পর জ্ঞান-ধর্ম্মের আলোচনা ও চর্চ্চা করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের হৃদয় যখন প্রশস্ত ও পবিত্র হইল, জ্ঞান যখন স্ফূর্ত্তি পাইল, তখন স্থিরবুদ্ধি হইয়া, শান্ত দান্ত সমা-

হিত হইয়া ব্রহ্মকে জানিয়া তাঁহারি প্রসাদে তাঁহারা পরমানন্দ লাভ করিলেন। তাঁহারা জ্ঞানচক্ষুতে দেখিলেন এবং অনুগত প্রিয় শিষ্যদিগকে বলিলেন

"ইদং বা অগ্রে নৈব কিঞ্চিদাসীৎ। সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ং। সবা এষ মহানজ আত্মাঽজরোঽমরোঽমৃতোঽভয়ঃ। সতপোঽতপ্যত সতপস্তপ্ত্বা ইদং সর্ব্বমসৃজত যদিদং কিঞ্চ।"

এই জগৎ পূর্ব্বে কিছুই ছিল না। এই জগৎ উৎপত্তির পূর্ব্বে কেবল একই অদ্বিতীয় সৎস্বরূপ পরব্রহ্ম ছিলেন। তিনি জন্মবিহীন, মহান্ আত্মা; তিনি অজর, অমর, নিত্য ও অভয়। তিনি বিশ্বসৃজনের বিষয় আলোচনা করিলেন; তিনি আলোচনা করিয়া এই সমুদয় যাহা কিছু সৃষ্টি করিলেন।

"এতস্মাজ্জায়তে প্রাণোমনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ।
খং বায়ুর্জ্জ্যোতিরাপঃ পৃথিবী বিশ্বস্য ধারিণী॥
ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াত্তপতি সূর্য্যঃ।
ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্দ্ধাবতি পঞ্চমঃ॥"

ইহাঁ হইতে প্রাণ, মন ও সমুদয় ইন্দ্রিয় এবং আকাশ, বায়ু, জ্যোতি, জল ও সকলের আধার এই পৃথিবী উৎপন্ন হয়। ইহাঁর ভয়ে অগ্নি প্রজ্বলিত হইতেছে, সূর্য্য উত্তাপ দিতেছে, ইহাঁর ভয়ে মেঘ, ও বায়ু ও মৃত্যু ধাবিত হইতেছে। তখন ঋষিরা লোকদিগকে উপদেশ দিলেন যে "যদি তোমরা সুখশান্তি চাও, পাপ হইতে পরিত্রাণ চাও, যদি তোমরা অমৃতলাভ করিতে চাও, তবে পরব্রহ্মের উপাসনা কর।" বিশ্বামিত্র ঋষি ব্রহ্মোপাসনা পদ্ধতি গায়ত্রীমন্ত্রে রচনা করিয়া লোকদিগের মধ্যে প্রচার করিলেন—

ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গোদেবস্য ধীমহি ধিয়োয়োনঃ প্রচোদয়াৎ।"

ভূলোক, দ্যুলোক এবং অন্তরীক্ষ, এই ত্রিলোক-প্রসবিতা পরমদেবতার বরণীয় জ্ঞানজ্যোতির তেজ, যাহা দ্বারা পাপের বীজ সকল দগ্ধ ও বিনষ্ট হইয়া যায়, সেই তেজ ধ্যান

করি ; যিনি আমাদিগকে ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ-প্রয়োজক বুদ্ধিবৃত্তি সকল প্রেরণ করিতেছেন। তিনি বলিলেন যে "এই গায়ত্রী জপের দ্বারা, জগতের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়কর্ত্তা পরব্রহ্মের উপাসনা কর।" মনুও এই বাক্য অনুসারে বলিয়াছেন

"প্রণবব্যাহৃতিভ্যাঞ্চ গায়ত্র্যা ত্রিতয়েন চ।
উপাস্যং পরমং ব্রহ্ম আত্মা যত্র প্রতিষ্ঠিতঃ"॥

প্রণব, ব্যাহৃতি ও গায়ত্রী, এই তিনের দ্বারা পরব্রহ্মকে উপাসনা করিবে, আত্মা যাঁহাতে প্রতিষ্ঠিত আছে। বিশ্বামিত্র ঋষি আরও বলিলেন "সেই সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কর্ত্তা পরব্রহ্মকে সূর্য্যের অন্তর্য্যামী ভাবিয়া গায়ত্রী জপের দ্বারা পাপ হইতে পরিত্রাণের জন্য তিন সন্ধ্যা উপাসনা কর।" আর্য্যেরা সেই অবধি গায়ত্রী মন্ত্রের দ্বারা সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কর্ত্তা পরব্রহ্মের উপাসনা করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহারা বেদের বিধান অনুসারে সূর্য্য অগ্নি

বায়ু প্রভৃতি পরিমিত দেবতাদিগেরও আরাধনা হইতে বিরত হইলেন না। তাঁহারা এই পরব্রহ্মের উপাসনা নিতান্ত কর্ত্তব্য বলিয়া ভাবিতেন। পরিমিত দেবতাদিগের উদ্দেশে প্রয়োজনমত যাগযজ্ঞ হইত; কিন্তু গায়ত্রীমন্ত্রের দ্বারা ব্রহ্মের উপাসনা আর্য্যদের প্রতিদিন করিতে হইত এবং প্রতিদিন তিনবার করিয়া উপাসনা করিতে হইত—তাঁহারা সূর্য্যের উদয়কালে পরমেশ্বরকে সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া, মধ্যাহ্নে পালনকর্ত্তা বলিয়া এবং সূর্য্যের অস্তকালে প্রলয়কর্ত্তা বলিয়া উপাসনা করিতেন। এই গায়ত্রীপাঠ তাঁহাদের নিত্যকর্ম্ম ছিল। এমন কি, যাগযজ্ঞ অনুষ্ঠানের সময়েও মধ্যে মধ্যে গায়ত্রী দ্বারা পরমেশ্বরের উপাসনা করিতে হইত।

আর্য্যেরা সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কর্ত্তা ব্রহ্মকে সূর্য্যের অন্তর্য্যামী পরমদেবতারূপেই উপাসনা করিতেন। তখন জ্ঞানধর্ম্মের এতটা উন্নতি

হয় নাই বলিয়া তাঁহারা নিরাধার ঈশ্বরকে ধারণা করিতে পারিলেন না ; তখন তাঁহারা নিরাধার ঈশ্বরের উপাসনার জন্য প্রস্তুত হইতে পারেন নাই। এখনও ভারতবর্ষে এই প্রকার গায়ত্রীমন্ত্রের দ্বারা ঈশ্বরের উপাসনা প্রচ-লিত আছে। কিন্তু বেদের সময় অপেক্ষা উপনিষদের সময়ে জ্ঞানের অনেক উন্নতি হইল ; তখন জ্ঞানের এত উন্নতি হইয়াছিল যে ঋষিরা প্রকাশ করিলেন

"স যশ্চায়ং পুরুষে যশ্চাসাবাদিত্যে স একঃ"

যিনি এই পুরুষে, যিনি ঐ আদিত্যে, তিনি এক।

"তদন্তরস্য সর্ব্বস্য তদু সর্ব্বস্যাস্য বাহ্যতঃ।"

তিনি সকলের অন্তরে, তিনি সকলের বাহিরেও আছেন।

"তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়।"

সাধক কেবল তাঁহাকেই জানিয়া মৃত্যুকে

অতিক্রম করেন—তদ্ভিন্ন মুক্তি প্রাপ্তির আর অন্য পথ নাই।

"ইহৈব সন্তোঽথ বিদ্মস্তদ্বয়ং ন চেদবেদির্মহতী বিনষ্টিঃ।
য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি অথেতরে দুঃখমেবাপিয়ন্তি॥"

এখানে থাকিয়াই আমরা তাঁহাকে জানিয়াছি; যদি আমরা তাঁহাকে না জানিতাম, তবে মহাবিনাশ প্রাপ্ত হইতাম। যাঁহারা ইহাঁকে জানেন, তাঁহারা অমর হয়েন; তদ্ভিন্ন আর সকলেই দুঃখ পায়।

স তন্ময়োহ্যমৃত ঈশসংস্থোজ্ঞঃ সর্ব্বগো ভুবনস্যাস্য গোপ্তা।
য ঈশেঽস্য জগতো নিত্যমেব নান্যোহেতুর্বিদ্যত ঈশনায়॥

তিনি তন্ময়, চৈতন্যময়; তিনি অমৃত, তিনি ঈশ্বর, তিনি আপনাতে আপনি স্থিতি করিতেছেন; তিনি জ্ঞানস্বরূপ, সর্ব্বত্রগামী এবং এই জগতের প্রতিপালক। যিনি এই জগতকে নিত্য নিয়মে রাখিতেছেন, তদ্ব্যতীত বিশ্বশাসনের আর অন্য হেতু নাই।

ঈশ্বরের মঙ্গল ইচ্ছা যে জ্ঞান ধর্ম্মের উন্নতি

হউক; তাহা এই আর্য্যদিগের দৃষ্টান্তে কেমন দেখিলাম।

চতুর্দ্দশ উপদেশ—আত্মোন্নতির উপায়।

(৮ আষাঢ়, রবিবার, ৬২ ব্রাহ্ম সম্বৎ ১৮১৩ শক।)

অসীম আকাশস্থিত সৌর জগৎ প্রতিষ্ঠিত হইতে কত কাল চলিয়া গেল। এই অগ্নিকুণ্ড বাষ্পাবৃত পৃথিবী অপেক্ষাকৃত শীতল হইয়া জীবজন্তু জন্মিবার উপযুক্ত হইতে কত কাল গেল। ক্রমে ক্রমে দুর্ব্বাদল হইতে বটবৃক্ষ প্রভৃতি বৃক্ষ সকল জন্মিতে, এবং তাহার সঙ্গে কীটপতঙ্গ হইতে হস্তীসিংহ পর্য্যন্ত জন্মিতে কত কাল চলিয়া গেল। কত কাল এই বনাকীর্ণ পৃথিবীতে ব্যাঘ্র ভল্লুকের সহিত পশুরাজ সিংহ রাজত্ব করিত। তাহার পরে সর্ব্বোৎকৃষ্ট মনুষ্যের জন্ম। ঈশ্বর আপনার অনন্ত জ্ঞান হইতে এক বিন্দু জ্ঞান

প্রসব করিয়া তাহাতে, বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মবৃত্তি-মূলক বিজ্ঞান দিয়া, জ্ঞানেন্দ্রিয়ের কর্ম্মেন্দ্রিয়ের শক্তি দিয়া, এবং মানসিক ভাবের উপরে মনুষ্যের অধিকার দিয়া, সেই জ্ঞান মনুষ্য-শরীরে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। সেই জ্ঞানই আত্মা। সেই যে মনুষ্য-শরীরে ঈশ্বর তাঁহার জ্ঞানের কণামাত্র দিয়াছেন, সেই জ্ঞান ক্রমে উন্নত হইয়া পিতা মাতা হইতে সন্তান-পরম্পরায় চলিয়া আসিতেছে। এইরূপে ঈশ্বর এক-রূপকে বহুপ্রকার করেন—"একং রূপং বহুধা যঃ করোতি"। পিতা মাতা যতটা জ্ঞানধর্ম্মের উন্নতি করিবেন, সন্তানও সেই উন্নত জ্ঞান-ধর্ম্মের অধিকারী হইবে। পিতা মাতার কত যত্নে আপনাদিগকে রক্ষা করা কর্ত্তব্য—তাঁহাদের উন্নতির উপরে বংশেরও উন্নতি অনেক পরিমাণে নির্ভর করে। পিতামাতার যখন ভাল অবস্থা থাকে, যখন তাঁহারা ধর্ম্মভাবে ও ভদ্রতাতে উন্নত থাকেন, সেই সময়ে যদি সন্তান

হয়, তবে সে সন্তান পিতা মাতার সেই উন্নত অবস্থা পাইবারই যোগ্যতা লাভ করে। কিন্তু পিতা মাতার আত্মা যদি ধর্ম্মভাব-বিবর্জ্জিত হইয়া কলুষিত থাকে, সেই সময়ে সন্তান হইলে, সে সেই দূষিত অবস্থা প্রাপ্ত হয়।

আত্মার উন্নতি ও দুর্গতি যেমন জন্মের উপরে নির্ভর করে, সেইরূপ তাহা সঙ্গ, শিক্ষা ও স্বীয় যত্নের উপরেও নির্ভর করে। আত্মার উন্নতির চারি নিয়ম আছে—(১) জন্ম, (২) সঙ্গ, (৩) শিক্ষা, (৪) সাধনা। কেহ উন্নত বংশে জন্মগ্রহণ করিলেও, সে সঙ্গ-দোষে শিক্ষা-দোষে, সাধনাভাবে মন্দ হইতে পারে; কেহ নিকৃষ্ট বংশে জন্মগ্রহণ করিলেও সঙ্গগুণে শিক্ষাগুণে, সাধনাগুণে ভাল হইতে পারে। জন্ম যেমন কুলেই হউক না কেন, আপনার সাধনা থাকিলে সে কুলকে উজ্জ্বল করিয়া দিতে পারে; আবার চারি অঙ্গ সম্পূর্ণ থাকিলে আত্মার এত উন্নতি হয় যে বলা যায় না। পূর্ব্ব-

কার আর্য্যেরা যে নিয়ম করিয়া দিয়াছিলেন—শূদ্র বৈশ্যের কর্ম্ম করিতে পারিবে না, বৈশ্য ক্ষত্রিয়ের কর্ম্ম করিতে পারিবে না, ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণের কর্ম্ম করিতে পারিবে না, তাহা সম্পূর্ণ টিঁকিতে পারে না। কেবলি যে জন্মে বড় হয়, তাহা নহে; সকলেই আপনার আপনার সাধনার বলে শ্রেষ্ঠ পদবী লাভ করিতে পারে। ভাল বংশে জন্মিলেও শিক্ষা না পাইলে, সাধনা না করিলে, সঙ্গদোষে অধোগতি হয়; যেমন ব্রাহ্মণ, উন্নত-বংশ হইলেও শিক্ষা না পাওয়াতে নীচ শ্রেণীর মধ্যে পড়িয়া যায়। যখন জন্ম, সঙ্গ, শিক্ষা ও সাধনা, এই চারি উপায়ের দ্বারাই আত্মার উন্নতি হইতে পারে, তখন এ প্রকার নিয়মবদ্ধ করা ভাল নহে যে একজাতির কর্ম্ম অপর জাতিতে কিছুমাত্র করিতে পারিবে না।

এখানে যতটুকু উন্নতি হইল, পরলোকে সে আবার তাহা হইতে আরও উন্নতি লাভ

করিবে। ঈশ্বর যে জ্ঞানধর্ম্মের বীজ দিয়াছেন, ক্রমাগতই তাহার উন্নতি হইবে। ঈশ্বর মুক্ত-হস্ত হইয়া আছেন, উপযুক্ত হইলেই উন্নতির পথে লইয়া যাইবেন কিন্তু সেই উপযুক্ত হই-বার জন্য আপনার সাধনা আবশ্যক। দেখ যে মানুষ প্রথমে বাহ্য বস্তু সুস্পষ্টরূপে দেখিতে পারে নাই, দূর নিকটের সম্বন্ধ ভাল উপলব্ধি করিতে পারে নাই, চলিতে পারে নাই, কথা কহিতে পারে নাই, তাহার আত্মা কত উন্নত হইয়াছে—ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতেছে। এখানে যতই উন্নতি হউক, তাহা পরাকাষ্ঠা নহে। মনুষ্য সেই উন্নত অবস্থা হইতে পরলোকে আপনাকে অনন্তকাল পর্য্যন্ত আরও উন্নত করিবে। পিতা যেমন পুত্রকে সব দেন, সেই রূপ ঈশ্বর সবই দিবেন, কিন্তু তাহার জন্য আমাদের ইচ্ছা চাই, সাধনা চাই।

ঈশ্বর আমাদিগকে স্বাধীন করিয়া দিয়াছেন—আমাদিগকে আপনার আপনার কর্ম্মের

জন্য দায়ী করিয়া দিয়াছেন। এই স্বাধীনতা পাইয়া আমরা যে আপনার আপনার চেষ্টাতে এত উন্নত হইতেছি, ইহাতে ঈশ্বরের কেমন মঙ্গল ইচ্ছা প্রকাশ পাইতেছে। এখানে কত বিপদ, কত পাপতাপ, কত রোগশোক ; তবু এই রোগশোক বিপদআপদ পাপতাপ অতিক্রম করিয়াও আত্মার কত উন্নতি হইতেছে। কত লোকে নিকৃষ্ট পিতা মাতা হইতে জন্মগ্রহণ করিয়া আপনার সাধনার গুণে সেই নিকৃষ্ট জন্মের বাধা অতিক্রম করিয়া কত উন্নতি লাভ করিতেছে। দেখ, সক্রেটিস তাহার দৃষ্টান্ত। সক্রেটিসের মস্তকের গঠন ও আকৃতি দেখিয়া এক জন তাঁহাকে বলিল—"আমার বোধ হইতেছে, তুমি অতি দুর্দ্দান্ত নিষ্ঠুর ব্যক্তি।" সক্রেটিস তাহা শুনিয়া বলিলেন "তুমি যাহা বলিতেছ, তাহা ঠিক; আমার অন্তরে দুর্দ্দম্য প্রবৃত্তি সকল রাজত্ব করিত, কিন্তু আমি আপনার চেষ্টা দ্বারা সেই সকলকে দমন করিতে পারিয়াছি।"

জন্মের উপরে কতকটা নির্ভর আছে বটে, কিন্তু অধিক নির্ভর আপনার আপনার সাধনার উপরে। সকল উপায়ের মধ্যে সাধনাই শ্রেষ্ঠ উপায়; কিন্তু যাঁহার জন্ম ভাল, শিক্ষা ভাল এবং সাধনা থাকে, তিনি বড় ভাগ্যবান্; তিনি উন্নত অবস্থার প্রকৃষ্ট অধিকারী। তাহার দৃষ্টান্ত শঙ্করাচার্য্য। শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্যের উৎকৃষ্ট কুলে জন্ম ছিল; তাঁহার সৎসঙ্গ ছিল; বেদ তিনি নিপুণরূপে শিক্ষা করিয়াছিলেন এবং ইহার উপরে তাঁহার আন্তরিক সাধনা ছিল—নিদিধ্যাসন ছিল। আত্মার উন্নতির যে চারি উপায় বলিয়াছি, সেই চারি উপায়ই শঙ্করাচার্য্যের ভাগ্যে ঘটিয়াছিল। তাই তিনি যদিও বত্রিশ বৎসর বয়সে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি ইহার মধ্যে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতিকূলে সংগ্রাম করিয়া নিজের অদ্বৈত মত সমুদয় ভারতবর্ষে প্রচার করিয়া গেলেন। বুদ্ধদেব যদিও জাতিতে ক্ষত্রিয়,

কিন্তু তিনি আপনার সাধনার বলে মনের বাসনা পরিত্যাগ করিতে এবং ধর্ম্মভাবকে তেজস্বী করিতে সক্ষম হইলেন। জাতি, সঙ্গ, শিক্ষা ও সাধনা, এই কয়টীই আত্মার উন্নতির কারণ; সকলের উপরে ঈশ্বরের প্রসাদ আবশ্যক, তাহা না হইলে কিছুই হইবে না।

এখন বোধ হয় যে স্পষ্ট বুঝিলে—আমাদের পরমপিতা পরমেশ্বরের নিত্য মঙ্গল ইচ্ছা এই যে জগতে জ্ঞানধর্ম্মের উন্নতি হউক। হে প্রিয় মনুষ্য সকল, তোমরা তাঁহার এই ইচ্ছায় যোগ দিয়া, এই ইচ্ছার অনুকূলে, জ্ঞানধর্ম্মের উন্নতির জন্য সাধনাতে কায়মনোবাক্যে নিযুক্ত হও; অশেষ কল্যাণ লাভ করিবে। জ্ঞানধর্ম্মের উন্নতিতে রাজ্যের উন্নতি; জ্ঞানধর্ম্মের উন্নতিতে সমাজের উন্নতি; জ্ঞানধর্ম্মের উন্নতিতে বংশের উন্নতি; জ্ঞানধর্ম্মের উন্নতিতে, প্রতিজনের ইহলোকে, পরলোকে, অনন্তকালে উন্নতি।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।